ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ।। ৬ পৌষ, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ২২ ডিসেম্বর, ২০০৮ ।। Website : www.eswastika.com

জঙ্গি দমনে জাতীয় তদন্ত সংস্থায় শর্ত চাপাচ্ছে সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কঠোর হাতে জঙ্গিদের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হঠকারী অবস্থান নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম সরকার। সারা দেশে উগ্রপন্থী হামলা ঠেকানো এবং জঙ্গিহানা হলে, ধৃতদের বিচারের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় তদন্ত সংস্থা গড়তে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্র। দিল্লীতে এন ডি এ জমানায় লালকৃষ্ণ আদবানী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীনই এমন একটি ফেডারেল এজেন্সি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তখনও সিপিএম বিরোধিতা করেছিল। এবার নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম দায়িত্ব নেওয়ার পর আবার জাতীয় তদন্ত সংস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। মুম্বাই হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এমন সংস্থা গড়া জরুরি বলে মনে করছে কেন্দ্র। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ভেবেছে এখন আর রাজ্যের সঙ্গে পরামর্শ করে নয়, সংবিধানের ২৪৬ ধারা মোতাবেক দেশে কোথাও জঙ্গি-হামলা হলে সরাসরি এই সংস্থা তদন্তে নামবে। রাজ্যের কোনও আগাম অনুমতি লাগবে না। সি বি আই তদন্তের ক্ষেত্রে কিছু রাজ্যের সম্মতি লাগে। উগ্রপন্থী দমনে সে সবের তোয়াক্কা করছে না কেন্দ্র। কিন্তু সিপিএমের এতে আপত্তি আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিল্লীকে নোট পাঠিয়ে বলেছে, নীতিগতভাবে জাতীয় তদন্ত সংস্থা গঠনে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু যে কোনও মামলায় এই সংস্থা তদন্ত করতে পারবে না। রাজ্যের মুখ্যসচিব বা স্বরাষ্ট্রসচিব যদি কোনও জঙ্গি হানার ঘটনায় জাতীয় তদন্ত সংস্থাকে ডাকা

(এরপর ৪ পাতায়)

সার্ক চুক্তি মেনে বন্দীদের প্রত্যর্পণ করুক পাকিস্তান

গূঢ়পুরুষ ।। গত ২৬ নভেম্বর থেকে টানা ৬০ ঘন্টা মুম্বাইতে পাক জঙ্গি তাণ্ডবের পর ভারতের পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে যে চরমপত্র দেওয়া হয় তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে দাউদ ইব্রাহিম, টাইগার মেমন, মাসুদ আজহার এবং হাফিজ সৈয়দকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে ভারতে পাঠাতে হবে। এরা প্রত্যেকেই ভারতে নরহত্যা, সন্ত্রাস ও জঙ্গি কার্যকলাপ ইত্যাদি করার পর পাকিস্তানে বহাল তবিয়তে বসবাস করছে এবং সেখান থেকে জেহাদি ফিদাইনদের ভারতে পাঠাচ্ছে। পাকিস্তান ভারতের এই দাবি সরাসরি খারিজ করে দিয়ে বলেছে যে এই দুই দেশের মধ্যে বন্দি প্রত্যর্পণের কোনও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। এই কথাটি পুরোপুরি মিথ্যা। অবশ্যই এমন চুক্তি আছে। পাকিস্তান এবং ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রনায়কদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে ১৯৮৭ সালে সার্কভুক্ত দেশগুলির সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে চুক্তি করা হয় যে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে তাদের গ্রেফতার করে বিচারের জন্য প্রত্যর্পণ করা হবে। এরপর ২০০৪ সালে সার্ক সম্মেলনে বন্দি প্রত্যর্পণের খুঁটিনাটি নিয়মও লিপিবদ্ধ করা হয়। অথচ পাকিস্তানের বর্তমান শাসকরা সেসব বেবাক ভুলে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ভারত সহ সার্কভুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রের উচিত সেই চুক্তির শর্তাবলী পাকিস্তানকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। কারণ, সার্কভুক্ত সব দেশের রাষ্ট্র প্রধানরাই এই বন্দি প্রত্যর্পণের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন।

১৯৮৭-র বন্দি প্রত্যর্পণের চুক্তিপত্র রচিত হয়েছিল পাঞ্জাবের শিখ সন্ত্রাসবাদীদের খালিস্তান আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। কারণ, পাক মদতে তখন স্বাধীন খালিস্তান গঠনের দাবিতে ভিন্দ্রানওয়ালার অনুগামীরা হিংসাত্মক আন্দোলন চালাচ্ছিল। এই চুক্তিপত্রের শুরুতেই বলা হয় যে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অপরাধের পর সার্কভুক্ত দেশে নিরাপদ আশ্রয় নিতে না পারে তার জন্যই এই চুক্তি করা হচ্ছে। ১৯৮৭ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়, "চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা সার্ক রাষ্ট্রজোটের মধ্যে কোনও দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যদি বন্দি প্রত্যর্পণের দ্বিপাক্ষিক

সার্ক সম্মেলনে উপস্থিত সার্কভুক্ত রাষ্ট্রপ্রধানরা।

চুক্তি না থাকে তবে সেক্ষেত্রে সার্ক সম্মেলনে স্বাক্ষরিত বন্দি বিনিময় চুক্তিকেই দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বলে মানতে হবে।" এই তিন নম্বর অনুচ্ছেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাসবাদীদের যাতে কোনও রাষ্ট্র আশ্রয় দিতে না পারে। তাদের অপরাধের বিচারের পর সেদেশের আইনে শাস্তি দেওয়া। ঠিক এই ব্যাপারটিতেই এখন পাকিস্তানের শাসকরা রাজি হচ্ছে না।

১৯৮৭ সালে সার্ক সম্মেলনে গৃহীত চুক্তিপত্রের এক নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে ঠিক কি কি অপরাধে অভিযুক্তদের প্রত্যর্পণ করা হবে। এই তালিকা বেশ দীর্ঘ। তালিকায় রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র ছাড়াও আছে নরহত্যা, পণবন্দি করা, বেআইনিভাবে বিস্ফোরক মজুত করা, আগ্নেয়াস্ত্রের চোরাচালান ও বিক্রয় এবং সন্ত্রাসে মদত দেওয়া। মুম্বাই কাণ্ডে যুক্ত আসল নাটের গুরুরা তালিকাভুক্ত সব অপরাধেই জড়িত। তবে পাকিস্তান এদের প্রত্যর্পণ করবে না কেন? তাছাড়া ২০০৪ সালে এই চুক্তি নবীকরণ করা হয় ইউনাইটেড নেশনের নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত সন্ত্রাসবাদ দমনে বিশ্বজুড়ে লড়াইয়ের প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। সার্কভুক্ত সবদেশের সঙ্গে পাকিস্তানও এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবেও (প্রস্তাব নং ১৩৭৩) বলা হয় যে সংযুক্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য রাষ্ট্রকে সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেফতার এবং শাস্তি দিতে হবে। প্রয়োজনে বন্দি প্রত্যর্পণও করতে হবে। এই ব্যাপারে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি না থাকলেও প্রত্যর্পণ করতে হবে। কারণ, সন্ত্রাসবাদীদের কোনও রাষ্ট্র নেই।

(এরপর ৪ পাতায়)

জঙ্গি হানার আশঙ্কাতেই কি প্রধানমন্ত্রীর মালদা সফর বাতিল ?

তরুণ কুমার পণ্ডিত ঃ মালদহ ।। সম্প্রতি মালদা জেলার বাংলাদেশ সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ, জাল নোট-এর কারবার এবং চোরাচালান বেড়ে গেছে। এর ওপর গোয়েন্দাদের নজর রয়েছে মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলির দিকে। মুম্বাইয়ে জঙ্গি হামলার জেরে মালদার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বি এস এফ নজরদারি বাড়িয়েছে। কিন্তু সীমান্তের নদীপথ দিয়ে জঙ্গিরা এদেশে ঢুকতে পারে বলে গোয়েন্দারা মনে করছেন। আর জঙ্গি হানার কোনও ঝুঁকি না নিতে চাওয়ার জন্যই কি গত ৭ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর মালদা সফর বাতিল হয়ে গেল? কুয়াশার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সফর বাতিল হয়েছে বলা হলেও কিছু প্রশ্ন উঠেছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে। কুয়াশা কাটার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা না করে প্রধানমন্ত্রী কেন কলকাতা থেকে দিল্লী চলে গেলেন। শেষ মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই সফর বাতিলের খবরে গনিখান চৌধুরীর পরিবারে হতাশা নেমে আসে।

সম্প্রতি অসম ও মুম্বাইতে জঙ্গি হামলায় পশ্চিমবঙ্গের সিম কার্ড জঙ্গিরা ব্যবহার করেছে এই খবর জানার পরও মালদা জেলার সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামগুলিতে এখনও বাংলাদেশি সিমকার্ডের যথেচ্ছ ব্যবহার চলছে। বি এস এফ জানিয়েছে, সীমান্ত এলাকার বেকার মুসলিমদের নাশকতামূলক কাজে ব্যবহার করতে তৎপর হয়েছে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন। মোটা টাকার বিনিময়ে তাঁদের অপরাধমূলক কাজে জড়ানোর চেষ্টা চলছে। জেলায় মোট ১৭৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তের পুরাতন মালদা ও হবিবপুর ব্লকের সীমান্তের বেশ কিছুটা অংশে নদী রয়েছে। বি এস এফের মালদহ সেক্টরের ডি আই জি প্রভাত সিং টোমার জানিয়েছেন, অপরাধ ঠেকাতে রাতে সীমান্ত এলাকাতে স্যার্চ লাইট ব্যবহার করলেও নদীপথে কাঁটাতারের বেড়া না থাকার জন্য জঙ্গিরা ওই জলপথ ব্যবহার করতে পারে। মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের তিলাসন ও সিরসি কলাইবাড়ি গ্রামের সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা গ্রামে ঢুকে ডাকাতি করছে ও গরু চুরি করছে। বি এস এফ-কে জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি। মালদা ও দুই দিনাজপুরে সম্প্রতি বি এস এফ বেশ কিছু অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। বি এস এফের জওয়ানরা কাঁটা

(এরপর ৪ পাতায়)

রামসেতু নিয়ে ব্যর্থতা ঢাকতেই চন্দ্র শেখরকে বলির পাঁঠা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কেন্দ্রের পুরাতত্ত্ব বিভাগের গতবৎসর বরখাস্ত হওয়া অফিসার চন্দ্র শেখর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অম্বিকা সোনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'রামসেতু' নিয়ে 'রাম'-এর অস্তিত্বই নেই বলে মন্ত্রকের তরফ থেকে সর্বোচ্চ আদালতে হলফনামা দায়ের করা হয়েছিল। পরে তা নিয়ে দেশজুড়ে প্রতিবাদ হয়। হিন্দু ভাবাবেগে ইচ্ছাকৃত ভাবে আঘাত দেওয়ার অভিযোগ উঠে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে। তখন বলির পাঁঠা করা হয় চন্দ্র শেখর এবং অন্য এক অফিসারকে। তাদেরকে দায়ী করে বরখাস্ত করা হয় ২০০৭-এর সেপ্টেম্বরেই। চন্দ্র শেখর পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগের প্রশাসনিক নির্দেশক ছিলেন। শ্রীশেখর কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হলফনামার ফলে উদ্ভূত রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং জনরোষ থেকে নিজেদেরকে আড়াল করতেই তাঁকে বলির পাঁঠা করা

সোনিয়া

হয়েছে। অন্য আর এক বরখাস্ত হওয়া অফিসার হলেন ভি বক্সী (সহ নির্দেশক-স্মারক)।

ইউ পি এ সরকারের হলফনামায় — 'রামের কোনওরকম বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই' বলাতে হিন্দুদের

(এরপর ৪ পাতায়)

চণ্ডীগড়ে বিস্ফোরক সহ ধৃত নেপালী শ্রমিক

চণ্ডীগড়ে বিস্ফোরক সহ ধৃতরা।

সংবাদদাতা।। গত ৯ ডিসেম্বর চণ্ডীগড় আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনাসে প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক সহ ৬ জন নেপালীকে পাকড়াও করেছে নিরাপত্তাকর্মীরা। শুধু ব্যাপক পরিমাণ বিস্ফোরকই নয়, তাদের কাছে পাওয়া গেছে ডিটোনেটরও। মুম্বাই-এ সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশেই পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীরা সন্দেহভাজন বাস-ট্রেন যাত্রীদের উপর কড়াকড়ি নজরদারি শুরু করে। পুলিশ জানিয়েছে, তল্লাশির সময় ওই নেপালী বাসযাত্রীদের ব্যাগ থেকে নিষিদ্ধ শক্তিশালী বিস্ফোরক ডিটোনেটর সহ বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাদের ব্যাগ থেকেই বিস্ফোরক বের হয়। চণ্ডীগড়ে ২৭ নং সেক্টরের লাগোয়া ওই বাস টার্মিনাস। ধৃত ছয়জনের মধ্যে একজন নাবালক।

উদ্ধার করা বিস্ফোরকের মধ্যে রয়েছে ১৪টি জিলেটিন স্টিক, ৬টি ডিটোনেটর, সাতমিটার লম্বা তার ও ফিউজ, বেয়ারিং ও অন্যান্য যা থেকে প্রচুর পরিমাণ আই ই ডি (ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস) তৈরি করা যায়। ওইসব আই ই ডি সাধারণত রাস্তা তৈরি ও খনিতে কাজে লাগে।

রাজ্য পুলিশের সন্দেহ, ধৃত ছয় নেপালীরা হিমাচল প্রদেশে পাথর খাদানে অথবা যেখানে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি হচ্ছে এরকম কোথাও কাজ করত। তারা ওখান থেকেই এসব চুরি করেছে। ধৃতরা কেউই কোনওরকম বিরোধিতা করেনি যখন তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল। চণ্ডীগড়ের এস এস পি সুধাংশু শ্রীবাস্তব বলেছেন, ধৃতদেরকে হিমাচল প্রদেশে নিয়ে যাওয়া হবে। দেখা হবে তারা সত্যি সত্যিই সেখানে রাস্তা তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিল কিনা। শ্রী শ্রীবাস্তব আরও বলেছেন, "আমরা এই মুহূর্তে ওদেরকে সন্ত্রাসবাদী বলে ধরে নিচ্ছি না, তবে ওই সকল বিস্ফোরক তারা যাদেরকে সরবরাহ করতে যাচ্ছিল তা জানার চেষ্টা করছি।" পুলিশ তদন্ত সম্পূর্ণ না হওয়া অবধি তাদেরকে হেফাজতে রাখতে চায়। চণ্ডীগড় পুলিশ অবশ্য একথা উড়িয়ে দিচ্ছে না যে, ওই নেপালী শ্রমিকরা শুধুই বিস্ফোরকের বাহক মাত্র। সন্ত্রাসবাদীরা এদেরকে দিয়ে বিস্ফোরক পরিবহনের কাজটা করিয়ে নেয়।

একজন উচ্চপদস্থ গোয়েন্দা অফিসারের কথায় ওই বিপুল বিস্ফোরক কাঠমাণ্ডুতে আই এস আই এজেন্টদের কাছে যাচ্ছিল কিনা তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করতে হবে।

কেননা দীর্ঘদিন ধরে নেপাল আই এস আই এর বড় ঘাঁটি। ওখান থেকে নতুন সন্ত্রাসবাদী ক্যাডার রিক্রুট করা ও পাকিস্তানে ট্রেনিং-এ পাঠানো হয়। অনেক সময়ই সন্ত্রাসী ক্যাডারদের নেপালী পরিচয়পত্র তৈরি করানো হয়।

নিরাপত্তায় গলদ

কলকাতা বন্দরে নেই কন্টেনার স্ক্যানার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মুম্বাই বন্দর দিয়ে পাকপ্রেরিত ও প্রশিক্ষিত উগ্রপন্থীরা ঢুকে সন্ত্রাস চালানোর পরও কেন্দ্রের ঘুম ভাঙেনি। কেননা, ৯/১১-তে আমেরিকায় হামলার পর মুম্বাই বন্দরে কন্টেনার স্ক্যানার বসলেও এখনও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কলকাতা বন্দরে কোনও কন্টেনার স্ক্যানার বসেনি। কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরে দীর্ঘদিন থেকে কন্টেনার স্ক্যানারই নেই। ৯/১১-র পর থেকেই কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট অন্ততপক্ষে দুটো স্ক্যানার দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়ে আসছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কাস্টমস্ থেকে ছাড়পত্র না পাওয়ার কারণে এখনও স্ক্যানার এসে পৌঁছায়নি। অথচ বড় বড় কার্গো অর্থাৎ মালবাহী জাহাজ নিয়মিতভাবে কলকাতা বন্দরে যাতায়াত করছে। এই কন্টেনার স্ক্যানার বসাতে অনেকটা জায়গাও লাগে। কলকাতা বন্দরে এজন্য জায়গা ছাড়া রয়েছে। পোর্ট-এর একজন অফিসার জানিয়েছেন, কাস্টমস বিভাগ থেকে মাটি পরীক্ষার কথাও বলা হয়েছে। অথচ এখনও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। স্টীলের বড় কন্টেনারে মালপত্র পরীক্ষায় স্ক্যানারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এসময় একমাত্র জহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্ট (মুম্বাই)-এর কাছে কন্টেনার স্ক্যানার রয়েছে।

কলকাতা বন্দরে মাল তোলা হচ্ছে।

ওই সরকারি অফিসারের কথায় দুটি স্ক্যানারের আনুমানিক বাজরদর কুড়ি থেকে তিরিশ কোটি টাকার মধ্যে। এক একটি বন্দরে কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছ'টা এরকম স্ক্যানার দরকার। মুম্বই বন্দরে ৯/১১-র পরই স্ক্যানার বসানো হয়েছে। চেন্নাই এবং কলকাতা বন্দরেও ওইরকম স্ক্যানার বসানোর কথা।

কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ কোনও ফাঁক রাখতে চান না। নতুন করে এবার ডগ স্কোয়াড, বম্ব স্কোয়াড এবং ক্লোজ সার্কিট টিভিও বসানো হবে বলে জানা গিয়েছে। কলকাতা পুলিশের নিজস্ব বম্ব স্কোয়াড থাকলেও বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজস্ব বম্ব স্কোয়াড চান। এছাড়া বন্দরের কর্মচারীদের জন্য বাইয়োমেট্রিক কার্ডএন্ট্রির ব্যবস্থাও (প্রত্যেকের নিজ নিজ হাতের ছাপসহ) খুবই দরকার। এই ব্যবস্থাও কেবলমাত্র মুম্বাই বন্দরে রয়েছে। আগামী বছরের মধ্যে হাতের ছাপ পরীক্ষার মাধ্যমে বন্দরে ঢোকা ও বের হওয়ার ব্যাপারটা হয়ে যাবে বলে জানা গেছে। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান অনুপ কুমার চন্দ জানিয়েছেন, তাঁরা বন্দরে বাইরের লোকের যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত করতে চান। শ্রীচন্দের মতে, বন্দর ও জাহাজের মধ্যে যোগাযোগ এবং পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া একান্ত জরুরি।

পশ্চিমবঙ্গেও কৃষক-আত্মহত্যা বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অনেক প্যাকেজ, ঋণ মকুব করার পরও সারাদেশে প্রতিদিন গড়ে ৪৬ জন কৃষক আত্মহত্যা করছে। এবং দুর্ভাগ্যবশত কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর নিজের রাজ্য মহারাষ্ট্র এব্যাপারে শীর্ষে রয়েছে। প্রসঙ্গত, শারদ পাওয়ার দীর্ঘদিন মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রীত্বও করেছেন। ২০০৭ সালে সারা দেশে ২৩৬৯ জন মহিলাসহ সর্বমোট ১৬,৬৩২ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। মহারাষ্ট্রে আত্মহত্যার সংখ্যা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি।

সরকারের ন্যাশন্যাল ক্রাইম রেকর্ডস্ ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৭ সালে সারা দেশে মোট আত্মহত্যার শতকরা ১৪.৪ শতাংশই কৃষক। ব্যুরোর হিসেবে সারা দেশে ২০০৭-এ আত্মহত্যার ঘটনা ১,২২,৬৩৭টি। এই বিবরণের শীর্ষক ছিল 'দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু এবং আত্মহত্যা-২০০৭।'

২০০৬ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৭,০৬০ জন। ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত আত্মহত্যাকারী কৃষকদের সংখ্যা ছিল ১,৮২,৯৩৬ জন। যে দেশের বেশির ভাগ মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল সেখানে এই ভয়াবহ অবস্থা এবং পরিসংখ্যান। মহারাষ্ট্র ছাড়াও আরও অন্য ছয়টি রাজ্যের প্রত্যেকটিতে ২০০৭ সালে এক হাজারের বেশি কৃষক আত্মহত্যা করেছে। মহারাষ্ট্রে ২০০৭-এ কেন্দ্র সরকার বিশেষ আর্থিক সুবিধা দিয়েছিল। অথচ ৪,২৩৮ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। যা ২০০৬ থেকে ২১৫ জন কম। কর্ণাটকে ২,১৩৫ জন, অন্ধ্রপ্রদেশ—১,৭৯৭ জন, ছত্তিশগড়—১,৫৯৩ জন, মধ্যপ্রদেশ—১,২৬৩ জন, কেরল—১,২৩৬ জন, পশ্চিমবঙ্গ—১,১০২ জন। এই প্রদেশগুলির সঙ্গে মহারাষ্ট্র মিলিয়ে সাতটি প্রদেশ কৃষক-আত্মহত্যার সংখ্যার বিচারে প্রথম সাত-এ রয়েছে। যেখানে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশ আত্মহত্যাকারী কৃষকের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় কমেছে সেখানে কেরল, কর্ণাটক এবং পশ্চিমবঙ্গের চিত্র উল্টো। আত্মহত্যাকারী কৃষকদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

২০০৭-এ পাঁচটি রাজ্যে একজনও কৃষক আত্মহত্যা করেনি — গোয়া, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড এবং ত্রিপুরা। এখানে আবার মণিপুরে ২০০৬ সালেও একজন কৃষকেরও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেনি। দেশের রাজধানীতেও ২৩ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে (একজন উপনগরী এলাকার)। কলকাতা ও মুম্বইয়ে একজন কৃষকেরও আত্মহত্যার ঘটনা নেই।

ওদিকে চেন্নাইয়ে ১৭ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। দেশের বড় শহরগুলোর মধ্যে ভূপালে সর্বাধিক ৩০ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যাকারী কৃষকদের মধ্যে ৭০৭ জন মহিলা বাদ দিলে বেশির ভাগের বয়ঃসীমা ৩০ থেকে ৪৪ বছরের মধ্যে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

প্রয়োজনে আঙুল বাঁকাইতে হইবে

ভারতে সাম্প্রতিক কালে যে সকল জঙ্গি হামলা হইয়াছে তাহা ছিল পুরোপুরি ছকে বাঁধা। জয়পুর, আমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লী এবং মুম্বাই-এ সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার ঘটনা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। মুম্বাই-এ গত ছাব্বিশ নভেম্বরে আতঙ্কবাদী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সংসদের দুই সদনে সব দলেরই একমত প্রকাশ পাইয়াছে—আর নয়, যথেষ্ট হইয়াছে। আতঙ্কবাদ ও তাহার উৎস পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপ চাই। ইতিমধ্যে কেন্দ্র সরকার ভারতের নিরাপত্তা প্রশ্নে কয়েকটি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা সংসদে পেশ করিয়াছেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, দেশবাসীকে এবং সর্বোপরি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও অফিসারকুলকে নতুন করিয়া দেশভক্তির পাঠ পড়াইতে হইবে। একথা ঠিক যে, কোনও অঞ্চ লে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীরা কোনও রকমেই তৎপরতা চালাইতে সক্ষম নয়, যদি না তাহারা স্থানীয় লোকজনদের কাছ হইতে সাহায্য বা সহায়তা না পায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদীরা বন্দুকের নলের সামনে স্থানীয় জনগণের কাছ হইতে সমর্থন আদায় করিয়া থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া কিনিয়া লওয়া হয় এবং সন্ত্রাসবাদীদের পুরোপুরি মদত দিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু এই কাজে বাধ্য হয় একটা অনুল্লেখ্য অংশই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসবাদীদের তাহারাই সাহায্য করিয়া থাকে যাহারা আগ্রহী।

বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশবাসীর প্রথম কর্তব্য হইবে তাহাদেরকে চিহ্নিত ও জনবিচ্ছিন্ন করা। কেন্দ্র সরকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে (কিংম্বা লোকসভার নির্বাচন আসন্ন বলিয়াই হোক) দেশের নিরাপত্তার প্রশ্নে কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চলিতেছে। কিন্তু সেইসঙ্গে সরকারকে দেশহিতৈষীর পরিচয়ে যেসব দেশদ্রোহী রহিয়াছে তাহাদেরকেও জনবিচ্ছিন্ন করিতে ব্যবস্থা লইতে হইবে। আজ একথা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে পাকিস্তান ক্ষণে ক্ষণেই ভারত বিরোধী জিগির তুলিতেছে। যেখানে পাকিস্তানের উচিত হইল ভারতের সঙ্গে সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলা ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সন্ত্রসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের সহিত মিলিয়া যৌথভাবে লড়াই করা। সেখানে তাহা না করিয়া পাকিস্তান যদি অন্য কোনও শক্তির পরামর্শে ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের ব্যবহার করিতে চায়, তাহাদেরকে অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়া সাহায্য করিয়া যাইতে থাকে এবং কার্যত পাকিস্তান এখনও এই নীতির কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করে নাই, তাই ভারতের প্রথম ও প্রধান কাজ হইতেছে পাকিস্তানকে আরও উচিত শিক্ষা দেওয়া।

মনে রাখিতে হইবে, পাকিস্তান ইতিমধ্যেই তিন-তিনবার ভারতের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে, কিন্তু প্রতিবারই তাহাকে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হইতে হইয়াছে। এমনকী শর্ত ভঙ্গ করিয়া আমেরিকার দেওয়া 'প্যাটন ট্যাংক' ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহারের পরও পর্যুদস্ত হইয়ছে। ইহার পরও সেইসব কথা ভুলিয়া গিয়া কার্গিল-যুদ্ধে ভারতের বিরুদ্ধে নামিয়াছিল। সেখানেও পূর্বেকার ফলেরই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। তবুও পাকিস্তানের শিক্ষা হয় নাই। তাহার ভারত বিরোধী জিগির অব্যাহত রহিয়াছে। সম্প্রতি আবার কৌশলটা পাল্টাইয়াছে পাকিস্তান। মুখে ভারতের সহিত সুসম্পর্ক ও শান্তি আলোচনা চাহিলেও কাজে ভারতের বিরুদ্ধে 'ছায়াযুদ্ধ' চালাইয়া যাইতেছে। মুম্বাই-এ সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের ঘটনা আমাদের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়া আর কী? তাই পাকিস্তানকে 'সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র' হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে। আর এই সূত্রেই ইসলামাবাদকে কয়েকটি কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বাধ্য করিতে হইবে। যেমন, হাফিজ সৈয়দ, দাউদ ইব্রাহিম, মাসুদ আজাহারকে বিচারের জন্য ভারতের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে। মুজফ্‌ফরাবাদ ও মানশেরাতে সন্ত্রাসবাদীদের শিবিরগুলি ধ্বংস করিয়া দিতে হইবে। লস্কর-এ-তৈবা, জৈশ-ই-মহম্মদ এবং অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির পরিকাঠামো ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাদের নেতাদেরকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। আই এস আই সহ সামরিক বিভাগকে সরাসরি নির্বাচিত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে হইবে। পরমাণু বিজ্ঞানী আবদুল কাদের খান ও তাহার পরমাণু বোমা তৈরির কালোবাজারিদের লইয়া আন্তর্জাতিক তদন্ত করিতে হইবে। আরব দেশগুলি হইতে সন্ত্রাসবাদীদের আর্থিক মদত দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। সেদেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলিকে লইয়া একটি জাতীয় সরকার গঠন করিতে হইবে যাহারা সন্ত্রাসবাদে মদত দিয়া থাকে এমন ইসলামি গোষ্ঠীগুলিকে অকেজো করিয়া দিতে পারে। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চ ল হইতে আল-কায়েদা ও তালিবান সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য আমেরিকা ও আফগান সেনাবাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানের যৌথ অভিযান চালাইতে হইবে। যেসব তালিবান গোষ্ঠী অস্ত্র প্রত্যর্পণ করিবে তাহাদেরই শুধু ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ইসলামি কোর্ট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মে পরিবর্তন করিতে হইবে। অর্থাৎ এককথায় সোজা আঙুলে ঘি না উঠিলে তাহা বাঁকাইতে হইবে।

এক্ষেত্রে আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা ফলদায়ী। আমেরিকা ৯।১১-র পর বেশ কয়েকজন আল কায়েদার পাকিস্তানী জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করিয়া আমেরিকায় লইয়া গিয়াছিল। একেবারে সাম্প্রতিককালে আমেরিকার বিমান বাহিনী আফগানিস্তান হইতে পাকিস্তানে ঢুকিয়া নিয়মিতভাবে পাকিস্তানে জনজাতি বহুল ওয়াজিরিস্তানে বোমা বর্ষণ করিয়া সন্ত্রাসবাদীদের নিকেশ করিয়া দিতেছে। ইহাও স্মরণে রাখিতে হইবে।

বাংলাদেশের ইমাম সাহেবদের সুচিন্তিত পরিকল্পনা

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি আমার এক বন্ধু দমদম বিমানবন্দরের কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে একটা রিক্‌সা নিয়ে ছিলেন বিমানবন্দরে গিয়ে বিমানের টিকেট কেনা এবং কিছু অনুসন্ধানের জন্য। ভাড়া ঠিক হওয়ার পর রিক্‌সায় চড়ে যেতে যেতে রিক্‌সাওয়ালার সঙ্গে তার যা কথাবার্তা হল তার কিছু অংশ সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করা।

রিকসাওয়ালাকে বন্ধুর প্রশ্ন : তোমার বাড়ি কোথায়?

রিকসাওয়ালা : বাবু, আমাদের বাড়ি বাংলাদেশে।

বন্ধু : আমাদের মানে? তোমরা কত জন?

রিকসাওয়ালা : বাবু আমরা ৫০-৬০ জন আছি।

বন্ধু : তা তোমরা এদেশে এলে কী ভাবে? তোমাদের ভিসা, পাশপোর্ট আছে?

রিকসাওয়ালা : না, বাবু আমাদের ওসব লাগে না, বর্ডারে লোক আছে তারাই সব ব্যবস্থা করে দেয়। তবে টাকা দিতে হয়।

বন্ধু : বাঃ ভাল ব্যবস্থা, তা তোমরা থাক কোথায়?

রিকসাওয়ালা : আমরা এই আশেপাশে এখানে থাকি, আমাদের দিন রাত কাজ। অনেক সময় রিকসাতেই ঘুমাই।

বন্ধু : তা তোমাদের এখানকার লোকেরা কেউ কিছু বলে না? থানা থেকে পুলিশ আসে না? ধরে নিয়ে যায় না?

রিকসাওয়ালা : না বাবু, থানাতেও আমাদের লোক আছে। পার্টির দাদারা আছেন। তাঁরাই সব সামাল দেন। আমাদের প্রত্যেককে তাদের ৫০০ টাকা করে দিতে হয়। তবে তারা বলে দিয়েছেন এই এলাকার বাইরে না যেতে।

বন্ধু ঃ তা তোমরা দেশে যাও না? তোমাদের বিবি বাচ্চারা সেখানেই থাকে?

রিকসাওয়ালা : হ্যাঁ বাবু, আমরা মাঝে মাঝে দেশে যাই। সেখানে গেলে মসজিদের ইমাম সাহেব আমাদের ডেকে পাঠান, নানা পরামর্শ দেন।

বন্ধু : তা তোমরা যে ভাবে এদেশে আসছ, সংখ্যায় বাড়ছ, আমরাই তো সংখ্যালঘু হয়ে যাব একদিন। তখন তো তোমরাই দেশটার দখল নিয়ে নেবে। তখন কি আমাদেরও মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে হবে?

রিকসাওয়ালা : না বাবু আপনাদের নামাজ পড়তে লাগবে না। একটু সময় লাগবে তো। তবে আপনাদের পরে যারা থাকবে তাদের নামাজ পড়তে লাগবে।

বন্ধু : তার মানে আস্তে আস্তে তোমরা এদেশটার দখল নিয়ে নেবে? তোমাদের ইমাম সাহেবরা কি বলেন?

রিকসাওয়ালা : ইমাম সাহেব তো তাই বলেন। বলেন এদেশে তোমরা খেতে পাও না, রুজি রোজগার নাই। তোমরা ইন্ডিয়া চলে যাও। সেখানে অনেক রকম কাজ আছে। যে যে রকম কাজ পাবা তাই করবা। আর ওখানকার লোকেরা যে মজুরী চায় তোমরা তার থিক্যা কম মজুরী নিবা। এতে তোমাদের কামের অভাব হবে না। যেমন ধরেন, অন্য রিকসা আপনার কাছে ২০ টাকা চাইত। আমি চাইলাম ১৫ টাকা, আপনি বললেন ১২ টাকা। আমি তাতেই রাজী হয়ে বললাম, ওঠেন। এখানকার রিকসা! কেউ ১২ টাকায় রাজি হবে না। আমাদের অনেকেই এখানে শাদী করছে। তাদের বিবিরা হিন্দুদের বাড়িতে কাজ করে। এখানকার মেয়ে বউ কাজের লোক যদি ১৫০ টাকা চায় তা হলে আমাদের বিবিরা ১২০-১৩০ টাকা চায়। তাই তারা সহজেই কাজ পায়। তাছাড়া আমাদের কেউ কেউ চা, পান, বিড়ির দোকান করছে। কেউ মাটি কাটার কাজ করে, কেউ ফেরিওয়ালা। লোকে জানে ওরা মুর্শিদাবাদের লোক। আসলে বাংলাদেশের। বাবু এদেশে আমাদের কাজের অভাব নাই।

বন্ধু : তোমাদের ইমাম সাহেব মুরুব্বীরা আর কি বলেন?

রিকসাওয়ালা : মুরুববীরা বলেন তোমাদের মধ্যে যারা পারবা হিন্দু পাড়ায় একটা করে খাসীর মাংসের-এর দোকান দিবা। দাম একটু কম রাখবা যাতে অন্য দোকানের খরিদ্দাররা তোমাদের দোকানে যায়। পরে দেশটা যখন আমাদের হয়ে যাবে তখন ওগুলোকে গোস্তের দোকান বানাবা। তালে হিন্দুরা আর ধারে কাছে থাকবে না। বাড়ি ঘর বিক্রী করে, দোকান ব্যবসা বন্ধ করে দূরে সরে যাবে। তখন তোমরা সেগুলান কিনে নেবা। ফলে এলাকাটা তোমাদের মহল্লা হয়ে যাবে। এরপর যেখানে জায়গা পাবে একটা মসজিদ বা মাজার বানাবে। পরে ধীরে ধীরে সেগুলা বাড়াতে থাকবে। সব জায়গায় আমাদের লোক থাকবে। টাকা দেওয়া থাকবে। কেউ কোনও বাধা দেবে না।

বন্ধু : সর্বনাশ! তোমাদের ইমাম সাহেব মুরুববীরা এই সমস্ত পরামর্শ দেন? তারা আর কি বলেন?

রিকসাওয়ালা : হ্যাঁ বাবু, আর এতে তো আমাদের ভালই হয়। উনারা আরও বলেন, তোমাদের লোক সংখ্যা আর একটু বাড়লে পঞ্চ ায়েত, পুরসভা, বিধানসভা সব জায়গায় তোমাদের ক্যান্ডিডেট দিয়ে তাদের জিতিয়ে আনবা। ইমাম সাহেব বলেছেন যেখানে মোছলমান ক্যান্ডিডেট্ থাকবে সে লাল পার্টিই হোক বা অন্য পার্টি, তাকেই ভোট দিয়ে জেতাতে চেষ্টা করবে। বাবু কিছু মনে করবেন না। ইমাম সাহেব বলেন, হিন্দুরা ভীষণ লোভী, স্বার্থপর আর বোকা। কিসে তাদের ভাল আর কিসে ক্ষতি সেটাও তারা বোঝে না। এই সুযোগটা কাজে লাগাবো। হিন্দুদের দিয়েই মোছলমানদের জন্য মাদ্রাসা তৈরি হবে। পুলিশে, সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ হবে। মোছলমানদের জন্য হিন্দুরাই ব্যবস্থা করে দেবে। টাকা পেলে এরা সব পারে। হিঁদুরাই সব জায়গায় মোছলমানদের সুবিধা করে দেবে। সব জায়গায় আমাদের লোক থাকলে দেশটা আমাদের হাতে চলে আসবে। হিন্দু পাড়ায় তোমরা বসবাস শুরু করবে। তারপর উপদ্রব শুরু করবে। ছোট-খাটো চুরি, ডাকাতি, মেয়েদের টিটকিরি মারা, ফুসলানো, হাত ধরে টানাটানি, অপহরণ এসব সুযোগ বুঝে করবে। ভয়ের কিছু নাই। টাকা দিয়ে পার্টি আর পুলিশের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে। তাছাড়া আমাদের লোকজন তো থাকছেই। পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেবে না। হিঁদুদের দুর্গাপূজা কালীপূজা সব বন্ধ করে দিতে হবে। বলতে হবে মসজিদের সামনে ঢাক বাজানো মূর্তিনিয়ে যাওয়া চলবে না। ওতে আমাদের গুনাহ্ হয়। এই সব আর কি। ইমাম সাহেব বলেন তাঁর পরামর্শ মতো কাজ করলে ১০।১৫ বছরের মধ্যে দেশটা মোছলমানে ভর্তি হয়ে যাবে। আর একটা মোছলমান ১০টা হিঁদুর সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। তা হলে ভয় কিসের? ইনশাল্লাহ্ ২০ বছরের মধ্যেই দেশটারে ইস্‌লামিক রাষ্ট্র করা যাবে।

“চারদিকে এত সন্ত্রাসী কাজকর্ম, বোমা বিস্ফোরণ, প্রাণহানি ক্ষয়ক্ষতি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ। কিন্তু, ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হলে হিন্দুদের কোনও বিকার নেই। তারা ব্যস্ত নিজেদের সংসার জীবিকা আর বিনোদন নিয়ে। মারাদোনাকে নিয়ে উন্মাদনা দেখলে মনে হয় না কলকাতায় কোনও সমস্যা আছে। একটা অশিক্ষিত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী যা বলছে কার্যত তাই হয়ে চলেছে।”

ড্র ড্র ড্র

ইতিমধ্যে আমার বন্ধুর গন্তব্যস্থল এসে পড়ায় বন্ধু রিকসা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিলে রিকসাওয়ালা সালাম করে রিকসা নিয়ে চলে গেল। বন্ধুর কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল একজন অশিক্ষিত বাংলাদেশী মুসলমান যা বলছিল পশ্চি মবঙ্গে সর্বত্র তো তাই ঘটে চলেছে। হিন্দু পাড়ায় একের পর এক মাংসের দোকান গড়ে উঠছে। পান বিড়ির দোকান, সাইকেল সারাবার দোকান, স্কুটার মোটর সাইকেল সারানো, হাওয়া দেওয়া বা পাংচার সারানোর দোকান সবই তো মুসলমানদের। লেপ-তোষক বা দর্জির দোকান। ফলের দোকান সবই মুসলমানদেরই। এমন কি স্টেশনারী দোকানও। হিন্দু পাড়ায় মুসলমানদের মেয়ে বউরা কাজ করতে আসছে। আমাদের এলাকায় ৩/৪টি পানের দোকান থাকতেও স্কুলের এক শিক্ষক খুব সম্ভব সিপিএম-এর সমর্থক একটি মুসলমানের পানের দোকান থেকে নিয়মিতভাবে পান কিনে খেতে খেতে যান। হিন্দুর একটি স্টেশনারী দোকান বন্ধ হয়ে গেল আর তার পাশেই মুসলমানের স্টেশনারী দোকান রমরমিয়ে চলতে থাকে। আর হিন্দুরাই তার খদ্দের। সাইকেল সারাবার বা হাওয়া দেওয়ার দোকানগুলি এমন এমন জায়গায় যে স্কুল কলেজের মেয়েগুলিই সেখানে ভিড় করে। রবিবার বা

(এরপর ৪ পাতায়)

এই সময়

স্মৃতিধর

অনেকেরই ধারণা মহিলাদের স্মৃতি শক্তি কম। বিজ্ঞানীরা কিন্তু অন্য কথা বলছেন। সম্প্রতি বিশেষজ্ঞ মেরিয়েন জে লেগোটা মহিলাদের বেশি স্মৃতিধর বলে জানিয়েছেন। জে লেগাটা হলেন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির পার্টনার ফর জেন্ডার স্পেসিফিক মেডিসিন-এর প্রতিষ্ঠাতা। অনান্য বিশেষজ্ঞরাও লেগাটার অভিমতকে মেনে নিয়েছেন। মহিলাদের মধ্যে ইস্টোজেন হরমোনের পরিমাণ বেশি থাকে। ফলে, তারা বহু পুরনো ঘটনা সহজেই মনে রাখতে পারে। ভয় এবং অভিজ্ঞতার ঘটনাকেও তারা মনে রাখতে পারে।

চার্চে কীর্তন

চার্চে কীর্তন! তাও আবার হয় নাকি! শুনতে অবাক শোনালেও খবর সত্য। চমকপ্রদ এই ঘটনা ঘটেছে ওয়াশিংটনে। স্যাক্রেড সার্কেল নামে এক সংস্থা ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল ক্যাথেড্রালে কীর্তনের আয়োজন করে। উপস্থিত ছিলেন অর্ধশতাধিক কীর্তন শ্রোতা।

উট অ্যাম্বুলেন্স

তাদের মুখে কথা নেই, অবলা। কিন্তু অবহেলিত তো নয়। উট বলে কী প্রাণ নেই। উটের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই, তাদের জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেছে রাজস্থানের একটি এন জি ও। উটের জন্য তৈরি হয়েছে অ্যাম্বুলেন্স। ৭০০ থেকে ৮০০ কেজি ওজনের উটকে দিব্যি ওই অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়া যাবে। আছে হাইড্রলিক ক্রেন। যা আহত উটকে তুলে আনতে পারবে।

চিন্তাহীন ঘুম

অফিসের চেয়ারে বসে ঘুম। বা রাত্রিতে ঘুম। ঘুম যখন যে ভাবেই আসুক না কেন, তৃতীয় কোনও ব্যক্তির তা নিয়ে কটাক্ষ করার অধিকার নেই। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিয়েছে। বিচারপতি এস বি সিনহা ও সিরিয়াক জোশেফের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চে র এই রায়। কোর্টের মতে ঘুম মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার খর্ব করা যাবে না।

দু'নম্বরি টাকা

শান্তির মরুদ্যানে জাল নোট ধরা পড়ার সংখ্যাটা রীতিমতো উদ্বেগজনক। খোদ বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যও বিধানসভায় এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন, এরাজ্যে ২০০৭-এর মার্চ থেকে ২০০৮-এর মার্চ পর্যন্ত ৭১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার জাল নোট ধরা পড়েছে। এই বিশাল অঙ্কের জাল টাকার ছড়াছড়ি মূলত পুলিশ-প্রশাসনের অপদার্থতারই পরিণাম। অনেকের মতে, বুদ্ধ দেববাবুর নিজেরই উচিত এই বিষয়ে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

বন্দী প্রত্যর্পণ করুক পাকিস্তান

(১ পাতার পর)

সন্ত্রাসবাদীরা কোনও রাষ্ট্রের নাগরিক নয়। তাই তাদের আড়াল করা চলবে না। করলে সেই দেশকে 'সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র' বলে ঘোষণা করা হবে এবং তাকে ধ্বংস করা হবে।

নিরাপত্তা পরিষদের এই প্রস্তাবকে সামনে রেখে ১৯৮৭ সালের চুক্তির নবীকরণের সময় কয়েকটি বিশেষ অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়। বলা হয় যে সন্ত্রাসের মাধ্যমে জনজীবনে আতঙ্ক ছড়িয়ে রাষ্ট্রকে নতজানু হতে বাধ্য করার চেষ্টা করা হলে তা দমনের জন্য সার্কভুক্ত দেশগুলি পরস্পরকে সমস্ত রকম সাহায্য করবে। সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে সব দেশ একজোটে কাজ করবে। রাজনৈতিক মত পার্থক্য ও বৈরিতা বাধা হবে না। আবার বলছি, পাকিস্তান এই ২০০৪ সালের চুক্তিতে বিনা আপত্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। এখন সেই স্বাক্ষরিত চুক্তি মানতে চাইছেনা। পাক রাষ্ট্র-শাসকরা ভুলে গেছেন যে, কোনও আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তা স্বাক্ষরকারী দেশগুলির অভ্যন্তরীণ আইন বলে গণ্য হয়। সময় এসেছে, সার্কভুক্ত দেশগুলির একযোগে বন্দি প্রত্যর্পণের জন্য পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করার। নতুবা ভবিষ্যতে সার্ক সম্মেলন তার গুরুত্ব হারাবে।

শর্ত চাপাচ্ছে সি পি এম

(১ পাতার পর)

জরুরি মনে করে তবেই তারা তদন্ত করতে পারবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও সি পি এম জাতীয় তদন্ত সংস্থার পায়ে বেড়ি পরাতে চায়। যে কোনও সংবেদনশীল মানুষ এমন অবস্থানকে দেশদ্রোহিতার নামান্তর বলেই মনে করবেন। কারণ, সারা দেশ জঙ্গি দমনে যখন একজোট হয়ে লড়ছে, তখন তাদের এই ভিন্ন অবস্থান দেশের সামগ্রিক নীতির বিরুদ্ধাচরণ নয় কি? এমনিতেই কলকাতা জঙ্গিদের আঁতুড়ঘর। রাজ্য অথবা কলকাতা পুলিশ এখন আর জঙ্গিদের ধরতে পারে না। গত কয়েক বছরে দেশের সমস্ত বোমা বিস্ফোরণে বেঙ্গল লিঙ্ক মিলেছে। মুম্বাই হামলায় ব্যবহৃত সিম কার্ড ও গিয়েছিল কলকাতা থেকেই। এরপরও বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য সরকার কার স্বার্থে জাতীয় তদন্ত সংস্থার পায়ে বেড়ি পরাতে চাইছে?

প্রধানমন্ত্রীর সফর বাতিল

(১ পাতার পর)

তারের বেড়া বাঁচাতে ব্যস্ত থাকায় অনুপ্রবেশ বাড়ছে। এদিকে জেলার অপরাধ ও জঙ্গি কার্যকলাপ রুখতে বিহারের তিনটি এবং দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলার সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে বসতে চলেছে উত্তর দিনাজপুর পুলিশ। মালদা জেলায় গত দু'মাসে দশ লক্ষের ওপর জাল নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এদিকে অনেক বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীকে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তাদের সার্টিফিকেট ও ভোটার কার্ড দেখিয়ে আদালত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় বি এস এফ ক্যাম্প থেকেই এম এল এ এবং এম পি-দের ফোন পেয়ে বি এস এফ অনুপ্রবেশকারী মুসলিম দুষ্কৃতীদের ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে।

রামসেতু নিয়ে ব্যর্থতা

(১ পাতার পর)

ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা হয়েছে বলে বিজেপি ইউ পি এ সরকারের ওপর অভিযোগ আনে এবং এ নিয়ে সারা দেশে উত্তেজনা ছড়ায়। তখন ইউ পি এ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী হলফনামা সংশোধন করার নির্দেশ দেন এবং হলফনামার কুড়ি নম্বর অনুচ্ছেদ বাদ দিতে বলেন। ওই অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছিল— 'পৌরাণিক মহাকাব্য রামায়ণ এবং রামচরিতমানসে যে সকল চরিত্রের কথা বলা হয়েছে তাদের বাস্তব অস্তিত্ব নির্বিরোধ সত্য নয়।' শ্রীশেখর বলেছেন, পুরাতত্ত্ব মন্ত্রকের মুখ্য তথ্য আধিকারিক রূপা শ্রীনিবাসন 'রাইট টু ইনফর্মেশন'-এর জবাবে জানিয়ে দেন— এরকম তথ্য পাওয়া যায়নি।' শ্রীশেখরের অভিযোগ, উপরোক্ত(রূপা শ্রীনিবাসনই হলফনামায় পরিবর্তন করেছিলেন। অথচ মন্ত্রক এখন বলছে, ২০ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন কে করেছিলেন তা অফিস রেকর্ড-এ নেই। রাজনৈতিক চাপান-উতোরের পাঁচদিন বাদে মন্ত্রক থেকে প্রধানমন্ত্রীকে বলা হয়েছিল— দপ্তরের যুগ্ম সচিব আর সি মিশ্র, প্রাক্তন সংস্কৃতি সচিব বাদল কে দাস এবং এ এস আই-এর ডিরেক্টর জেনারেল অংশু ব্যাস পরস্পর আলোচনা করেই ১৯ এবং ২০ নং অনুচ্ছেদে রদবদল করেছেন যে হলফনামার খসড়া চূড়ান্ত করেছিলেন শ্রীমিশ্র নিজে। শ্রীশেখর তাঁর অভিযোগপত্রে বলেছেন, হলফনামা বিতর্কের অন্তত দু'মাস আগে ৬ সেপ্টেম্বর বৈঠকের কথা ওই হলফনামায় উল্লেখই করা হয়নি।

ইমাম সাহেবদের সুচিন্তিত মতামত

(২ পাতার পর)

ছটির দিনে ভোরবেলায় মাংসের দোকানে বিরাট লাইন। দুর্গাপূজার নবমীর দিন মাংসের দোকানে হিন্দুদের লাইন দেখলে মনে হয় জবাই করা পাঁঠার মাংস না খেলে তাদের পুণ্যার্জন বৃথাই যাবে। অথচ মুসলমানরা এক কোপে কাটা মাংস ছোঁয় না, বলে "ও গুনাহ্ হ্যায়"। আজকাল পাড়ায় পাড়ায় সাইকেল ভ্যানে সব্জী বিক্রী হয়। সব্জীওয়ালাদের নাম জিজ্ঞেস করলে বলে মন্টু, ভোলা, বিজয়, বিনোদ ইত্যাদি। এদের অধিকাংশই মুসলমান সেখ মন্টু বা সেখ ভোলা। ফলওয়ালারা তো সবাই মুসলমান। হাওড়া স্টেশনের আশে পাশে যারা ফল সব্জী লেবু প্রভৃতি নিয়ে বসে, তাদের প্রায় সবাই মুসল্মান। হিন্দুরাই এদের খদ্দের, হিন্দুরাই এদের রক্ষাকর্তা। এদের এতই দাপট্ যে বছর কয়েক আগে বামফ্রন্ট সরকারের এক বিধায়ককেই এদের দ্বারা হেনস্থা হতে হয়েছিল। আট, দশ বছর আগেও যেটা দেখা যেত না এখন সেটা হামেশাই ঘটে চলেছে। মুসলমান যুবকেরা ৩/৪ জনের দল বেঁধে হিন্দু পাড়ায়, হিন্দু এলাকায় আসছে, কাপ্তানি করছে, হাসি- মস্করা করছে সুযোগ বুঝে হিন্দু মেয়েদের কটু মন্তব্য করছে, বা অন্যভাবে উত্যক্ত করছে। হিন্দুদের থেকে কোনও প্রতিবাদ নেই বরং হিন্দুরাই নানাভাবে এদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। গত ঈদের দিন (২.১০.০৮) তিনটি মুসলিম যুবক নতুন পাজামা পাঞ্জাবী মাথায় সাদা টুপি পরে একটি মোটর সাইকেলে হিন্দু পাড়ায় তীব্র বেগে গাড়ি চালিয়ে কাপ্তানি করল। হিন্দুরা কেউ কোনও কথা বলল না। গত জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় (৭ই নভেম্বর ০৮) কয়েকটি মুসলমান যুবক বড়বাজার পুজো প্যান্ডেলের কাছে এক দোকানদারের সঙ্গে প্রচন্ড বাদানুবাদে লিপ্ত হল, মারামারি হওয়ার উপক্রম। অর্থাৎ এরা কোনও কিছুরই পরোয়া করছে না। এরা ভালমতোই বুঝে নিয়েছে কয়েকটি রাজনৈতিক দল এদের পদলেহন করছে। থানা পুলিশ প্রশাসন এদের হুকুমেই চলবে। আর হিন্দুরা তো ভীতু কাপুরুষ। তাহলে ভয় কিসের?

এদেশে বাংলাদেশীরা যেমন দলে দলে ভিসা পাশপোর্ট ছাড়াই ঢুকছে আর বহাল তবিয়তে বসবাস করছে, তেমনই পঞ্চায়েত, পুরসভা, পুলিশ, প্রশাসন সর্বত্র মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ছে। প্রশাসন থেকে বেআইনি মাদ্রাসাগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে, মাদ্রাসার জন্য অনুদান বাড়ানো হচ্ছে। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে। সরকার উচ্চ শিক্ষার জন্য মুসলমানদের সব খরচ বহন করছে। মুসলমানদের বেআইনি কাজকর্মের বিরুদ্ধে যেমন হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করা, সংবিধান অগ্রাহ্য করা প্রভৃতির জন্য সরকার নির্বিকার থাকে। অর্থাৎ সব রকমভাবে চলছে পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের অঙ্গীভূত করার প্রচেষ্টা। আর আশ্চর্য হিন্দুদের মানসিকতা। চারদিকে এত সন্ত্রাসী কাজকর্ম, বোমা বিস্ফোরণ, প্রাণহানি ক্ষয়ক্ষতি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ। কিন্তু, ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হলে হিন্দুদের কোনও বিকার নেই। তারা ব্যস্ত নিজেদের সংসার, জীবিকা আর বিনোদন নিয়ে। মারাদোনাকে নিয়ে উন্মাদনা দেখলে মনে হয় না কলকাতায় কোনও সমস্যা আছে। একটা অশিক্ষিত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী যা বলছে কার্যত তাই হয়ে চলেছে। হিন্দুরা যখন এটা বুঝবে তখন কিছু করার থাকবে না। এটা হিন্দুরা কবে বুঝবে?

রাজ্য রাজনীতি

মারাদোনা নিয়ে মাতামাতির পর পরিবহন ধর্মঘট

আসল লক্ষ্য পুলিশ নয়, পুলিশমন্ত্রী

নিশাকর সোম

এই রাজ্যে ঝামেলা থামছে না। কারণ রাজ্য সরকারের অপদার্থতা এবং সরকারের পরিচালক সিপিএম নেতৃত্বের ব্যর্থতা।

ডানলপ বন্ধ। মালিক পবন রুইয়া টাটাদের মতো আর্থিক সুবিধা দাবি করেছেন। সরকারকে চাপ দেবার জন্য তৃণমূলের নেত্রী মমতা ব্যানার্জির নিকট গিয়ে দরবার করেছেন। পশ্চি মবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের সব রঙিন ফানুস ফেটে গেছে। পৌরসভার

সহস্রাধিক বার শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার পরও তাঁকে রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীতে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। এর কারণ কী? কেন সুভাষ চক্রবর্তীকে কোনও অনুশাসন মানতে বাধ্য করা হয় না। এর রহস্য নিশ্চয়ই আছে।

নির্বাচনে সিপিএম-এর ভোটের হার কমেছে তৃণমূলের আসন বেড়েছে — বিজেপি হাওড়াতে খাতা খুলেছে। বহরমপুরে সিপিএম-কে সাফ করে দিয়েছে কংগ্রেস। এই নির্বাচনে যদি ১:১ হতো তা'হলে সিপিএম সংখ্যালঘিষ্ঠতে পরিণত হতো।

এরই মধ্যে গিমিক-এর মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী গিমিক সৃষ্টি করতে উদ্যোগ নিলেন, যোগাযোগ করলেন সেলিব্রিটি ম্যানেজমেন্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে মারাদোনাকে দিয়ে প্রোগ্রাম করাতে চাইলেন। মারাদোনা আসছিলেন মাদার টেরিজার সংস্থায়। মারাদোনার অ্যাপিয়ারেন্স-এর জন্য দশকোটি দাবি করা হল! রাজ্য সরকারের ক্রীড়া দপ্তর থেকে আট কোটি টাকা মঞ্জুর করা হোল! এই সেই ক্রীড়ামন্ত্রী যিনি সৌরভ গাঙ্গুলিকে সংবর্ধনা দেওয়ার কথাতে বলেছেন "মুড়ি মিছরির এক দর হবে কেন?"

এই সেই ক্রীড়ামন্ত্রী যিনি বস্তুত ক্রীড়াবিদদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন এমনকী এই ক্রীড়ামন্ত্রী বহু অ্যাথলেট সাঁতারুদের সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিলেন বলে শোনা যায়। এদিকে সিপিএম বিরোধী ক্রীড়ামন্ত্রীর ভক্তকে পর্বতারোহণের জন্য আর্থিক সাহায্য দিতে কার্পণ্য করেনি যেমন তাদের পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় তিনটি বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজের গোষ্ঠী-রাজনীতির ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন।

এরপর আসুন মারাদোনার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠানের কেলোর কীর্তি! এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতদের সম্পর্কে রাজ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সঙ্গে কোনও পরামর্শ তো দূরের কথা কোনও কিছুই জানানো হল না। কারণ তথ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য টাকা দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তাই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এলেন না বোধহয় পূর্বাহ্নে আমন্ত্রণই পাননি? মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতার চক্রগড়ার খেলা ক্রীড়ামন্ত্রী এখন চালিয়ে যাচ্ছেন। নেপথ্যে ক্রীড়ামন্ত্রীর "শ্রীকৃষ্ণ" কি আছেন। ক্রীড়ামন্ত্রী মারাদোনার জন্য খোলা ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন মঞ্চ সাজিয়ে ছিলেন — সবই বিফল হল কারণ মারাদোনা সাদা টুপি-কে খুব পছন্দ করছিলেন না বলে সংবাদে প্রকাশ।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের অনুষ্ঠানে ঝামেলায় নষ্ট হল-এর কারণ হলো—এই অনুষ্ঠানের "সুরক্ষার" জন্য ক্রীড়ামন্ত্রীর বাহিনীদের স্বেচ্ছাসেবক ব্যাজ লাগিয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাই কি বিশৃঙ্খলার চরম দেখা গেল। এই সম্পর্কে এক নামী ক্রীড়া সাংবাদিক সদ্যোজাত এক

জ্যোতি বসু মারাদোনাকে কাস্ত্রোর ছবি দেখাচ্ছেন।

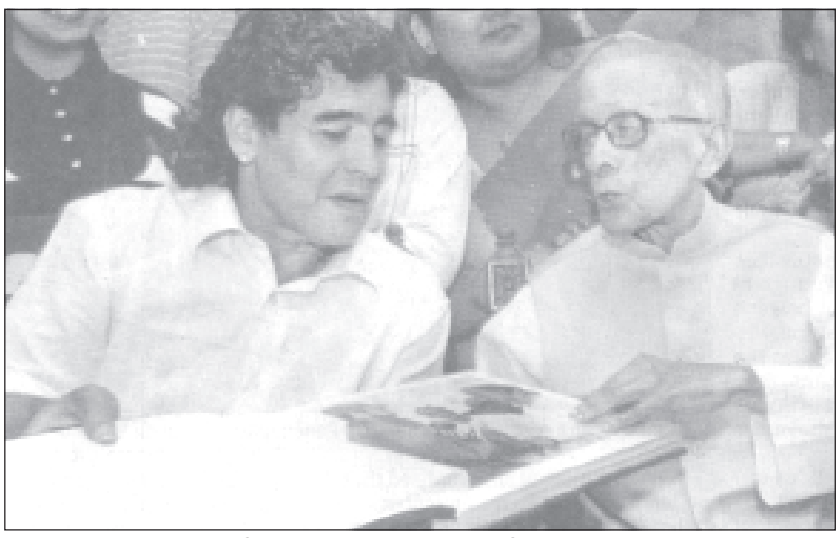

বাংলা দৈনিকে লিখেছেন "মস্তান আর মন্ত্রী ব্যর্থ। যদিও ক্রীড়ামন্ত্রী বলে থাকেন মৃত মানুষকে বাঁচানো ছাড়া সব কিছু পারেন।" এরপর মারাদোনাকে একরকম জোর করে ক্রীড়ামন্ত্রীর "শ্রীকৃষ্ণ" এর সকাশে নিয়ে যাওয়া হল। কি লজ্জার কথা এক প্রাচীন বয়সের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে বায়োডাটা জমা দিতে হল মারাদোনাকে। এমনকী ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে তাঁর ছবি দেখাতে হল মারাদোনাকে। ছিঃ ছিঃ, এতো পার্টির লজ্জা — রাজ্যের লজ্জা নয় কি? আরও কেচ্ছা আছে ক্রীড়ামন্ত্রী থুড়ি গিমিকমন্ত্রী "শ্রীকৃষ্ণের" বাড়ি পেছনের দরজা দিয়ে মারাদোনাকে ঢোকালেন! 'শৃঙ্খলা রক্ষার' জন্য ক্রীড়ামন্ত্রীর গোষ্ঠী স্বেচ্ছাসেবক পুলিশ অথবা বিশেষ বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন। বেপরোয়াভাবে সাংবাদিক চিত্রসাংবাদিকদের বেধড়ক পেটানো হল এবং অশ্রাব্য গালাগাল করা হল। এক বৈদ্যুতিন চ্যানেল 'সুভাষ চক্রবর্তী কুভাষ-এ' যা তা বললেন — যা রকের ছেলেরাও বলেন না!

এই পেটানো সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয় ইন্দিরা ভবনে গিয়ে বুদ্ধ দেববাবু জ্যোতি বসুকে সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে সমস্ত ঘটনা বলেছেন।

একথা অনীস্বাকার্য জ্যোতি বসুই সুভাষ চক্রবর্তীকে আস্কারা দিয়েছেন এটা আজ পার্টির বেশির ভাগ কর্মী বলে থাকেন। সহস্রাধিক বার শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার পরও তাঁকে রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীতে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। এর কারণ কি? কেন সুভাষ চক্রবর্তীকে কোনও অনুশাসন মানতে বাধ্য করা হয় না। এর রহস্য নিশ্চয়ই আছে। পার্টি নেতাদের বেশ কিছু ঘটনা কি সুভাষ চক্রবর্তীর জিম্মায় আছে? রাজ্য দপ্তরের নেতা সুশীল চৌধুরীর হত্যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলাকর্মী মনীষার নিখোঁজ হওয়ার তদন্তের রিপোর্ট কেন প্রকাশ হলো না?

এখানেই শেষ নয় ক্রীড়ামন্ত্রী সদলবলে মালয়েশিয়া তথা মধ্য প্রাচ্যের সফরে গেলেন। কোটি কোটি টাকা ব্যয় হবে। অনুমোদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য। স্মরণ করা যেতে পারে অলিম্পিকে যাবার জন্য ক্রীড়ামন্ত্রী সদলবলে চীনে যাবার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন না দেওয়াতে ক্রীড়ামন্ত্রীর দলের চীনে যাত্রা হলো না।

'সুভাষ চক্রবর্তী' নিয়ে এতো কথা জড়ো করে লেখার কারণ অনেক বিরোধীদল নেতা-নেত্রী সুভাষবাবুকে "আমাদের লোক" বলে মনে করতেন!

এছাড়া নন্দীগ্রাম সিঙ্গুর জঙ্গলমহল মারাদোনা কাণ্ডের সৃষ্টি কর্তাদের শাসন ক্ষমতা থেকে নামাতে হবে। সুভাষ চক্রবর্তীর আর একটি কীর্তি হল পরিবহন ধর্মঘট ডাকিয়ে দেওয়া। বস্তুত এই পরিবহন ধর্মঘট পুলিশ অর্থাৎ পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধ দেববাবুর বিরুদ্ধে। এই ধর্মঘট ডাকিয়ে দিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী বিদেশে বেড়াতে গেলেন। কারণ তিনি জানেন মন্ত্রী হিসাবে ওটাই তাঁর শেষ বিদেশযাত্রা। কারণ পরে আর তাঁদের মন্ত্রিসভা থাকবে না। এর জন্য সমস্ত বিরোধীদের এক হয়ে ১:১ করতে পারলেই এটা সম্ভব হবে। শুধু মৌখিক তীব্র সমালোচনা অথবা শাণিত বাক্য দিয়ে প্রবন্ধ লিখেও সিপিএম-কে সরানো যাবে না।

অন্যরকম

বনরক্ষক বিশনোইরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। যখন ভারতজুড়ে বনজ সম্পদ আর বন্য প্রাণীকে লুটে-পুটে খাওয়া চলছে তখন ভারতেই এর বিপরীত চিত্র দেখা গেল রাজস্থানে। রাজস্থানে যোধপুর জেলার বনবাসী বিশনোই-রা প্রকৃতিপূজক। তাদের কাছে প্রকৃতির সব দানই পবিত্র। এজন্য তারা গাছ কেটে কখনও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে না। অথচ যেখানে গাছের সংরক্ষণ হওয়ার কথা, হাওড়ার সেই বোটানিক্যাল গার্ডেন-এর গাছ কাটা হয়। অসমের সংরক্ষিত বনাঞ্চ লে বন কেটে বাংলাদেশীরা বসতি স্থাপন করে সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে। বিশনোইরা কোনও বন্যপ্রাণীর গায়ে হাত দেয় না।

বিশনোই ধর্ম-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পঞ্চ দশ শতাব্দীতে। প্রতিষ্ঠাতা জম্ভেশ্বর ভগবান। এই ধর্মমতের উনত্রিশটি মূল নীতি। তারা সাত্ত্বিকভাবে জীবন-যাপনের পক্ষপাতী। রাজস্থানের মরুস্থলীর বনাঞ্চ লে তারাই বন্যপ্রাণীর রক্ষক। ১৯৯৮-এ তারা মুম্বই সিনেমার বিতর্কিত চরিত্র সলমন খানের চিনকারা হরিণ মারার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন

নিজস্ব পোষাকে বিশনোই রমণী।

করেছিল।

বিশনোই সমাজের বর্তমান প্রধান তুলসীরাম মনজু জানালেন, ১৭৩০ সালেও বিশনোই সমাজ খেজারলি গ্রামে তাদের প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় দিয়েছিল। যোধপুর থেকে ২৪ কিলোমিটার দূরের ওই বিশনোই অধ্যুষিত গ্রামে রাজার লোকেরা পরিত্যক্ত খেজুর গাছ কাটতে এসেছিল। বিশনোই সমাজ তখন রুখে দাঁড়ায়। তিনশজন শহীদ হন। পাঁচশ বছর ধরেই বিশনোইরা তাদের প্রকৃতি রক্ষার পরম্পরা ধরে রেখেছে। প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের এক উজ্জ্বল উদাহরণ তারা প্রস্তুত করেছে। তিনি আরও বললেন, তাঁরা তাদের মৃতদেহ দাহ করেন না কাঠ বাঁচাবার জন্য। পরিবর্তে কবর দেন। জ্বালানির জন্য গাছ বা গাছের ডাল কাটেন না, শুধু মরে যাওয়া গাছ বা গাছের ডাল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করেন।

এই অনুপম উদাহরণ হল প্রকৃতিকে শোষণ না করার, প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সহাবস্থানের। বিশনোই সমাজের দুঃখ একটাই যে, অন্যরা তাদের মতো দৃষ্টান্ত গ্রহণ করছেন না।

বাংলাদেশে নির্বাচন ঃ '০১ সালের বিভীষিকা আজও তাড়া করছে ভোলার হিন্দুদের

হাসিব রহমান, ভোলা ।। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই চরম শঙ্কা আর উৎকণ্ঠা বেড়ে যাচ্ছে ভোলার নির্যাতিত নিপীড়িত হিন্দু পল্লীগুলোতে। এক অজানা ভীতির মধ্যে রয়েছে জেলার প্রায় অর্ধলক্ষ হিন্দু ভোটার। ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের সময় হিন্দুদের ওপর বর্বরোচিত নারী নির্যাতন, তাণ্ডবলীলার কারণে এবারও তারা শঙ্কার মধ্যে রয়েছে। যে দলই ক্ষমতায় আসুক এ বছরও যে তাদের ওপর নগ্ন হামলা হচ্ছে না তার পর্যাপ্ত নিশ্চয়তা এখনও পাওয়া যায়নি। নির্বাচন মানেই হিন্দুদের কাছে তা নির্যাতন। ভোলার মাটিতে ২০০১ সালের সংখ্যালঘু নির্যাতনের ইতিহাসের ৭ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও ভুলতে পারছে না সেই বিভীষিকাময় দিনগুলো। নির্যাতনের চিহ্ন এখনও রয়ে গেছে সংখ্যালঘু পল্লীতে। দেশ ছেড়ে বহু সংখ্যালঘু পরিবার চলে যাওয়ার পরও শত অত্যাচার, নির্যাতন, সম্ভ্রম, ধনসম্পদ হারিয়ে দেশ ও মাটির টানে যেসব অসহায় হিন্দু সংখ্যালঘু পরিবার আছে তারা এবার নির্বাচনে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও ভোটাধিকারের নিশ্চয়তা দাবি করেছে। ক্ষোভ দুঃখে আক্ষেপ করে এক হিন্দু ভোটার বলেন, "এভাবে নির্বাচন এলে যদি লাঞ্ছিত হতে হয় তাহলে এ নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। নাগরিক অধিকার

> **অজানা ভীতির মধ্যে রয়েছে জেলার প্রায় অর্ধলক্ষ হিন্দু ভোটার।.... ভোলার মাটিতে ২০০১ সালের সংখ্যালঘু নির্যাতনের ইতিহাসের ৭ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও ভুলতে পারছে না সেই বিভীষিকাময় দিনগুলো। নির্যাতনের চিহ্ন এখনও রয়ে গেছে সংখ্যালঘু পল্লীতে।**

প্রয়োগের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলে তারা এবার ভোট দেবেন।" এসব তথ্য সংখ্যালঘু অধ্যুষিত একাধিক সূত্রে পাওয়া গেছে।

সূত্রগুলো জানিয়েছে, লালমোহন উপজেলার লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের অন্নদাপ্রসাদ গ্রাম অনুসন্ধানে কয়েকদিন আগে সাংবাদিকরা গেলে নৃশংসতার শিকার গৃহবধূ পঙ্গু শেফালী রানী দাসকে সেই দুর্বিষহ দিনগুলোর কথা জিজ্ঞেস করতেই আঁতকে ওঠেন। তিনি জানান, সেদিন নিজের জীবন আর ইজ্জতকে বাঁচাতে ঘর ছেড়ে পার্শ্ববর্তী গঙ্গাচরণ দাসের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওই বাড়িতে তাঁর মতো আরও অনেক গৃহবধূ আশ্রয় নেয়। কিন্তু পাষণ্ড নরপিশাচদের রাক্ষুসে থাবা থেকে সবাই পালাতে পারলেও শেফালী পঙ্গুত্বের কারণে পারেননি। শেফালীর এখন আর কিছুই হারানোর ভয় নেই। আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু পরিবেশে হলে তিনি এবার ভোট দিতে যাবেন। কিন্তু প্রশ্ন, সেই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কতটুকু?

ওই একই রাতে শাশুড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া ও পুত্রবধূ সুজাতাও রক্ষা পাননি। প্রসাদ চন্দ্র ক্ষোভে দুঃখে আক্ষেপ করে বলেন, এভাবে নির্বাচন এলে যদি লাঞ্ছিত হতে হয় তাহলে নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। নাগরিক অধিকার প্রয়োগের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলে তারা এবার ভোট দেবেন। একই কথা জানিয়েছেন পার্শ্ববর্তী ভবঞ্জন দাস (৪০), নিশিবাড়ির তপন চন্দ্র রায় (৪৮), মতি ঘোষ (৩৮)। একই গ্রামের রামকৃষ্ণ দাসের স্ত্রী লাভলী রানী (৩৫) গত নির্বাচনে ভোট দিতে পারেনি। সে দিন তিনি ধানক্ষেতে লুকিয়ে নিজেকে রক্ষা করেন। আর তাঁর স্বামী খালের জলে ডুবে থেকে নিজেকে রক্ষা

করেন। হুমকির ভয়ে শ্যামল চন্দ্র দাস (৩০) গত নির্বাচনে ভোট দিতে পারেনি। যদি এবার সুষ্ঠু পরিবেশ হয় তা হলে ভোট দেবে বলে আশা করেন। ২০০১ সালে হিন্দুদের নির্যাতনের ঘটনায় অনেকে ভারতে গেলেও তাঁরা যাননি। সুষ্ঠু নির্বাচন হলে দেশ ছাড়বেন না। ব্রজলাল মাস্টারের বাড়ির পুষ্প রানী দাস (৬০) গত নির্বাচনের দিন অনেক হুমকির মুখে ভোট দিয়েছেন। ভোট দিয়ে বাড়ি ফিরে দেখেন তাঁর পুত্রবধূ মায়া রানীকে পিটিয়ে শরীরের সমস্ত অলঙ্কার খুলে নেওয়া হয়েছে। ছেলে তপন দাসকেও বেধড়ক পিটিয়েছে। তবে এ বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকার সুন্দর পরিবেশে ভোট নেওয়ার ব্যবস্থা করলে সবাই ভোট দিয়ে নিরাপদে থাকতে পারবেন বলে জানান। জি এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারি শিক্ষক শ্যামল চন্দ্র চৌধুরী জানান, নির্বাচন পরবর্তী সময়টাই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। ওই সময় তাদের নিরাপত্তা দিতে হবে। তাই তাদের এলাকায় পুলিশ ক্যাম্পটি স্থায়ীভিত্তিতে রাখার দাবি জানান। পলানবাড়ির সুবল চন্দ্র দাস (৭০) জানান, পুলিশ ক্যাম্প নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে। গত মাসে হঠাৎ করে ক্যাম্পটি উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। পরে তাদের দাবির মুখে আবার রাখা হয়। ক্যাম্পটি সরিয়ে নেওয়া হলে তাদের ওই এলাকায় টিকে থাকা সম্ভব হবে না বলেই মন্তব্য করেন তিনি। শুধু লালমোহনের ওই দুটি গ্রামই নয়। জেলার সব উপজেলায় ২০০১ সালে কম বেশি সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে ভোলা জেলা প্রশাসক মোঃ মিসবাহুল ইসলাম জানান, নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের সময় ও পরে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে।

(সৌজন্যে ঃ দৈনিক সংবাদ, বাংলাদেশ)

ট্রান্স অরুণাচল হাইওয়ে

সংবাদদাতা ।। স্টীলওয়েল রোড একবার খোলা হলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে অরুণাচল প্রদেশ সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সড়ক-পথে সীমান্ত বাণিজ্যের অনেক দ্বার খুলে যাবে। রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী নাবাম টুকি চাংলাং জেলার জয়রামপুরে এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন। অরুণাচল প্রদেশ সরকার 'ট্রান্স অরুণাচল হাইওয়ে' নামে যে মহাসড়ক পরিকল্পনা করেছে তাতে 'তিরাপ ও চাংলাং' জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলিকে যুক্ত করা হবে। এছাড়া এই হাইওয়ের মাধ্যমে তাওয়াং থেকে তিরাপ পর্যন্ত সমগ্র রাজ্যকে আড়া-আড়ি ভাবে যুক্ত করা হবে। রাজ্যের জন্য প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক গুচ্ছপ্রকল্পের অধীন মেজর রোড প্রজেক্ট পিছিয়ে থাকা তিরাপ ও চাংলাং জেলাকে আর্থ-সামাজিক ভাবে অন্যান্য উন্নতিশীল জেলাগুলির সমতুল্য করবে। বর্ডার রোড্স অর্গানাইজেশন এই কাজে মুখ্য ভূমিকা নেবে।

নবদ্বীপে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান অনুমোদিত নবদ্বীপ সংস্কৃত পরিষদ পরিচালিত ত্রৈমাসিক সংস্কৃত প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপন সমারোহ গত ৩০ নভেম্বর খগেন্দ্রনাথ উর্মিলাদেবী স্মৃতিভবনে সম্পন্ন হল। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন কাশীধামের বেদান্তের প্রাক্তন অধ্যাপক পণ্ডিত হরিহর চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি সঙ্ঘের নবদ্বীপ বিভাগ সঙ্ঘচালক বৃন্দাবন ধর গোস্বামী। এছাড়া ছিলেন কেন্দ্র সংযোজক ডঃ অরুণ কুমার চক্রবর্তী।

গুয়াহাটিতে এন এস জি-র দাবি রাজ্যপালের

সংবাদদাতা ।। অসমের রাজ্যপাল শিবচরণ মাথুর সন্ত্রাসে ক্ষতবিক্ষত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য এন এস জি ব্যাটেলিয়নের দাবি জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসীদের আক্রমণের পর সর্বদলীয় বৈঠকে বসেন। পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে এন এস জি ব্যাটেলিয়ন স্টেশন করার সিদ্ধান্ত হয়। রাজ্যপাল মাথুর বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মুম্বাইয়ের পুনরাবৃত্তি হলে তৎক্ষণাৎ যাতে এন এস জি ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারে তাই গুয়াহাটিতে এন এস জি স্টেশন করার দাবি জানাচ্ছেন।

বাংলাদেশে নির্বাচন

একাধিক আসনে লড়ছেন বহু শীর্ষ নেতা

আবদুল সাত্তার ।। দুর্নীতি দমন আইনে বাংলাদেশের পঁচাত্তরজন শীর্ষস্থানীয় নেতার আগামী সংসদীয় নির্বাচনে প্রার্থীপদ বাতিল ঘোষিত হলেও অধিকাংশ আসনগুলো আগলে রেখেছেন প্রবীণ নেতারা। প্রায় প্রতিটি

শেখ হাসিনা

বেগম খালেদা

এরশাদ

জাতীয় দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা-নেত্রীরা একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাছাড়া নবাগতদের বেশীর ভাগই প্রাক্তন নেতা-মন্ত্রীদের পরিবারের লোক। তবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া তার চারটি গুরুত্বপূর্ণ কাগজে চার রকম জন্ম তারিখ ব্যবহার করায় ভুয়া জন্ম তারিখ ব্যবহারের অভিযোগ এনে তার মনোনয়ন পত্র বাতিলের দাবি জানিয়ে আন্দোলনে নেমেছে অন্যান্য দলগুলি।

বাংলাদেশের উচ্চ আদালত দুর্নীতি দমন আইনে একশ তিনজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে অভিযুক্ত করেন এবং তাঁদের পঁচাত্তরজন নেতা সংসদীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না বলে রায় দিয়েছেন। কিন্তু তার পরও বাংলাদেশের রাজনীতিতে নবীন নেতাদের প্রবেশ তেমনভাবে হচ্ছে না। বিশেষ করে শহর এলাকার আসনগুলো রয়ে গেছে প্রাক্তন নেতা-মন্ত্রীদের দখলে। বি এন পি সভাপতি খালেদা জিয়া গত নির্বাচনে পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এবার নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মোতাবেক ফেনী-১, বগুড়া-৬ ও ৭ নং আসনে নির্বাচন করছে।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এগুলো হল ঢাকা-১৭, রংপুর-৩ এবং কুড়িগ্রাম ২ নং আসন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রংপুর-৬, গোপালগঞ্জ তিন এবং বাগেরহাট এক নম্বরে আসনে।

আসন্ন সংসদ নির্বাচনে নতুন মুখ কম আসায় প্রবীণদের মধ্যেই লড়াই জমে উঠেছে। বৃদ্ধি পেয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা, অস্থিরতা। নওগাঁ পাঁচ নম্বর আসনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুদল জলিলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন বি এন পির দুই হেভিওয়েট নেতা মোঃ হাসান সিদ্দিকী ও লেঃ কর্ণেল (অব) লতিফখান। শেরপুর দুই নম্বরে আসনে বেগম মতিয়া চৌধুরীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাবেক লুইপ জাহেদ আলী চৌধুরী।

নেতৃবৃন্দের পরিবার থেকে আসা বহু সাংসদ প্রার্থীর বাবা, ভাই, স্বামী বর্তমানে দণ্ডিত বা কারান্তবীন্দ অবস্থায় রয়েছেন। রাজশাহীর প্রাক্তন মন্ত্রী আমিনুল হকের জায়গায় দেওয়া হয়েছে তার ভাই এনামুল হককে। নাটোর দুই নং আসনে রসুল কুদ্দুসের জায়গায় স্থান পেয়েছেন তাঁর স্ত্রী সাধনা ইয়াসমিন ছবি। এদিকে ভুয়া জন্ম তারিখ ব্যবহারের অভিযোগে বি এন পি চেয়ারম্যান খালেদা জিয়া বিরোধীদের তোপের মুখে। একই ব্যক্তির চারটি জন্ম তারিখ থাকতে পারে না বলে অভিযোগ করেন ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন।

অভিযোগে বলা হয়, খালেদা জিয়ার ভোটের তালিকায় জন্ম তারিখ পনের আগস্ট, ম্যারেজ রেজিস্টারে ৯ আগস্ট, ১৯৪৪, এইচ এস সি পরীক্ষার সার্টিফিকেটে জন্মের তারিখ পাঁচ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬। একটি পাসপোর্টে তার জন্ম তারিখ দেখানো হয়েছে সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ ইং। ভুয়া জন্ম তারিখ ব্যবহারের অভিযোগ এনে ছাত্রলীগ সহ বিরোধীরা তার মনোনয়ন পত্র বাতিলের দাবি জানিয়ে গোটা দেশে নতুন করে আন্দোলন শুরু করেছে।

অবাধ, সুষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনে আস্থা সৃষ্টির জন্য মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগ বিরোধীরা। তার ভোটার তালিকা থেকে নাম এবং নির্বাচন কমিশন থেকে তার মনোনয়নপত্র বাতিলের দাবি জানিয়ে বহু আবেদন পত্র জমা দিয়েছে নির্বাচন দপ্তরে।

(সৌজন্যে ঃ দৈনিক সংবাদ)

দিল্লী ও রাজস্থানে ব্যর্থতা

নতুন দিশা নিতে হবে বিজেপিকে

এন সি দে ।। ব্যর্থতা যখন কোনও দল, ব্যক্তি বা রাষ্ট্রকে হতাশ করে তখন বুঝতে হবে সেই দল, ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। ব্যর্থতা যখন কারও কাছে কেবলই একটি শিক্ষা, তখন সেই ব্যর্থতা সৃষ্টি করে নতুন উদ্যম। দিল্লী ও রাজস্থানে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের জন্য পারস্পরিক দোষারোপ বি জে পি-র পক্ষে মোটেই শুভ হবে না। মনে রাখতে হবে নির্বাচনী কৌশল ঠিক করা আর দাবার চাল একই জিনিস। চালে ভুল হলে হার, আর সঠিক চাল হলে কিস্তিমাত। চালে কোথায় ভুল ছিল এটাই খুঁজে বার করতে হবে। এবং শিক্ষা নিয়ে নতুন দিশা ঠিক করতে হবে।

কংগ্রেসের এই জয়ের পিছনে কাজ করেছে মুসলিম ঐক্য ও দূরদর্শিতা আর বি জে পি'র ব্যর্থতার জন্য দায়ী হিন্দুদের অদূরদর্শিতা আর জাত-পাতে দীর্ণ গোটা হিন্দু সমাজ। ধর্মীয় কারণেই মুসলিমরা অনেক রেজিমেন্টেড (সামরিক বাহিনীতে যেমন সৈন্যরা থাকে নিজ নিজ রেজিমেন্টে শৃঙ্খলাবদ্ধ)। প্রয়োজনে তারা যে কোনও সিদ্ধান্ত ঐক্যবদ্ধ ভাবে গ্রহণ করতে পারে। এবারের নির্বাচনে মুসলিমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস দলকে এককাট্টাভাবে ভোট দিয়েছে এটা প্রমাণিত। এ কাজে মুসলিম এলাকায় মুসলিম প্রার্থী দিয়ে সব তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির মতো কংগ্রেসও মুসলিমদের নিজেদের ধর্মের লোককেই ভোট দিতে সাহায্য করেছে। মুসলিমরা কখনই মুসলিম নামধারী কোনও রাজনৈতিক দলকে ভোটে দাঁড় করাতে সাধারণত চায় না কারণ, তারা জানে তাদের সংখ্যাটা এখনও এমন জায়গায় পৌঁছায়নি যাতে শুধু মুসলিম ভোটে জেতানো যাবে। এ কাজে তারা কাজে লাগায় তাদের বিশ্বস্ত ও তাদের কৃপাপ্রার্থী তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নেতা ও তাদের দলগুলিকে। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভোটকে ভাগ করার জন্য তারা কাজে লাগায় জাত-পাত নিয়ে রাজনীতি করা নেতা-নেত্রী ও তাদের দলগুলিকে। যেমন এবার কাজে লাগিয়েছে বহুজন সমাজবাদী পার্টিকে।

দিল্লী বিধানসভার নির্বাচনে মুসলিম অধ্যুষিত ১২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৮টিই দখল করেছে। এই ৮টি আসন হল ওখলা, চাঁদনি চক, বাল্লিমারান, বিকাশপুরী, সীমাপুরী, সিলামপুর, মুস্তাফাবাদ এবং সদর

বাজার। ওখলা কেন্দ্রের মধ্যেই পড়ে কুখ্যাত 'বাটলা হাউস' যেখানে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে তরুণ পুলিশ অফিসার নিহত হয়েছিলেন। ওখলা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন লোকাল স্ট্রংম্যান পারভেজ হাশমি। তিনি জিতেছেন মাত্র ৫১৪ ভোটে। তার বিরুদ্ধে আর জে ডি এবং বি এস পি প্রার্থী দিয়ে হিন্দু ভোট কাটাকাটি করতে সাহায্য করেছে। যেসব কেন্দ্রে তুলনামূলকভাবে কম মুসলিম থাকেন সেখানেও জাত-পাতের জিগির তুলে হিন্দুদের ভোট ভাগ করেছে লালু-মায়াবতীর দল। এতে মাত্র ২০ শতাংশ মুসলিম ভোট পেয়েই কংগ্রেস বাজিমাত করে দিয়েছে। দাবা খেলার কিস্তিমাতের মতো। কংগ্রেস মোট ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েছে, তার মধ্যে ২০ শতাংশই মুসলিম ভোট। বি জে পি পেয়েছে ৩৭ শতাংশ ভোট। বি এস পি সেখানে পেয়েছে ১৪ শতাংশ। এর সবটাই হিন্দু ভোট হলে অবাক হ'ব না। বাদবাকি আর জে ডি এবং এল জে পি (রামবিলাসের দল) — এরা সবাই মুসলিমদের বিশ্বস্ত দল। তাই বলে সংখ্যালঘুরা এদের ভোট দিয়ে মুসলিম ভোট ভাগ করেনি। যেখানে এরা শক্তিশালী মুসলিমরা সেখানে এদের ভোট দিয়ে জিতিয়েছে। যেমন মতিয়া মহল কেন্দ্রে এরা এল জে পি প্রার্থীকে জিতিয়েছে। অবশ্যই তিনি মুসলিম প্রার্থী, নাম শোয়েব ইকবাল। এক কংগ্রেস নেতা তো পরিষ্কার বলে দিয়েছেন "আমরা পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব দিল্লীর মুসলিম কলোনীগুলো থেকে ভোট পেয়েছি।" তবে দক্ষিণ দিল্লী ও তুঘলকাবাদ এলাকাতেও বি জে পি ভোট পায়নি।

মজার কথা হল টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে আগামী ৫ বছর দিল্লীকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নগরীতে পরিণত করার বরাত যারা পেল তাদের ৬০ শতাংশ গ্র্যাজুয়েটও নন। কেউ কেউ অষ্টম/নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। কংগ্রেসের ৪২ জন জয়ী সদস্যের মধ্যে ১৯ জন গ্র্যাজুয়েট হিসাবে ডিক্লারেশন দিলেও, তারা কিন্তু আধুনিক মানের শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। এই সমীক্ষায় নন্-মেট্রিককে নন্-গ্র্যাজুয়েট হিসাবে দেখানো হয়েছে। অতএব এবারের বিধানসভার মান বিশ্বের কাছে লজ্জাজনক। অন্যদিকে বি জে পি'র জয়ী ২৩ জন সদস্যের মধ্যে ১৪ জন অর্থাৎ ৬০ শতাংশই গ্র্যাজুয়েট। এর মধ্যে একজন আবার দু'টি বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট — ইংরাজি ও হিন্দীতে এম এ।

ইনি হলেন সাহেব সিং চৌহান। দিল্লী ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে জয়ী বি জে পি এম এল এ করণ সিং তানওয়ার আবার দিল্লী ইউনিভার্সিটির স্নাতক- বি এস সি অঙ্কে (অনার্স)।

যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেই কথায় ফিরে যাই। মুসলিম মৌলবাদ এখন তার আগ্রাসী চেহারা আর চাপা দিতে পারছে না। সাধারণ হিন্দুরাও প্রশ্ন তুলছে; সব মুসলমান সন্ত্রাসবাদী না হলেও সব সন্ত্রাসবাদীরা মুসলমান কেন? এই প্রশ্নকে চাপা দিতে আজ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, হিন্দি ফিল্মের অভিনেতা নাসিরুদ্দিন, অভিনেত্রী শাবানা আজমির মতো মুসলিম বুদ্ধি জীবীরা সোচ্চার হয়েছে। অন্য দিকে মুসলিমরা দ্রুত ভোটার হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। তাদের অতি পুরানো বিশ্বস্ত খিলাফতী রক্ত রঞ্জিত কংগ্রেসী হাতে তারা হাত মিলাতে শুরু করেছে। এ কাজে তারা তাদের আর এক বিশ্বস্ত উজির মোল্লা মূলায়মকে কাজে নামিয়েছে প্রত্যক্ষভাবে। আর অপ্রত্যক্ষভাবে কাজে নেমেছে লালু আর মায়াবতীর দল। পশ্চিমবঙ্গের ধূর্ত শৃগালরা তো আছেই। কংগ্রেসীদের শিকার থেকে সুযোগ পেলেই খুবলে খাওয়ার জন্য।

এই অবস্থায় বি জে পি-কে এক নতুন পথের দিশারী হতেই হবে। দ্রুত হিন্দু ভোট মেরুকরণের দিকে এগোতেই হবে। খোলাখুলি সরাসরি কোনও ঢাক ঢাক গুড় গুড় নয়। মায়াবতীর দলকে সব কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়া থেকে বিরত করতেই হবে। প্রথমে আলোচনার মাধ্যমে, না হলে প্রকাশ্যে আক্রমণাত্মক প্রচার করে। এবারের দিল্লী ও রাজস্থানের নির্বাচনে বি এস পি-র সব কেন্দ্রে প্রার্থী দাঁড় করানোর বিষয়ে কংগ্রেসী প্রসাদপ্রাপ্ত মিডিয়াগুলো বি জে পি'কে বিভ্রান্ত করেছিল এই বলে যে এর ফলে কংগ্রেসের খুব ক্ষতি হবে। বি জে পি এই প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। তাদের কল্পনাতেও ছিল না, হিন্দু ভোট কখনও এক মেরুতে থাকে না। ভোট ভাগ হলে তো হিন্দু ভোটই ভাগ হবে। দলিত হরিজনরা কি হিন্দু নয়? বিপুল সংখ্যক দলিত হরিজন গুজ্জর প্রভৃতিদের হিন্দুস্থানকে বাঁচানোর লড়াইয়ে সামিল না করলে সমূহ বিপদ আসবে। পারস্পরিক দোষারোপ ছেড়ে নতুন দিশায় এগনোই বিজেপি'র পক্ষে শুভ হবে বলেই মনে হয়।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তাবড় তাবড় প্রার্থীরা মহিলা প্রার্থীদের হাতে কুপোকাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সদ্য সমাপ্ত পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে মিনি সাধারণ নির্বাচন বা আগামী লোকসভা নির্বাচনের সেমিফাইন্যাল যাই বলা হোক না কেন, এই নির্বাচনে এবার একটি বিশেষ দিক সামনে উঠে এসেছে। আর তা হল — মহিলা প্রার্থীদের হাতে তাবড় তাবড় প্রার্থীদের কুপোকাৎ হওয়া। প্রাপ্ত হিসাব মতো কংগ্রেস সর্বাধিক ৭১ জন মহিলা প্রার্থীকে নির্বাচনী লড়াইয়ে লড়বার সুযোগ দিয়েছিল। তাদের মধ্যে ৩৫ জন মহিলা প্রার্থী নির্বাচনে জিতেছেন। এরপরই ভারতীয় জনতা পার্টি — এই দল সত্তর জন মহিলা প্রার্থীকে নির্বাচনে লড়াইয়ের আসরে নামিয়েছিল। তাদেরও ২৯ জন জয়লাভ করেছে। এককথায় বলা যায়, উভয় দলই প্রায় আর্দ্ধেক সাফল্য লাভ করেছে। সব মিলিয়ে এবারের নির্বাচনী ফলাফল দেশের দুটি দলের কাছেই অপ্রত্যাশিত ছিল। রাজস্থানে কংগ্রেসের মহিলা প্রার্থীরা বেশি জিতেছেন — ২৩ জনের মধ্যে ১৩ জন। বেশির ভাগ মহিলা প্রার্থীরা সাত হাজার থেকে দশ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন। এমনকী দিল্লীতে কংগ্রেসের ৮ জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে চারজন জয়লাভ করেছেন।

তবে অন্য তিন রাজ্যের মহিলা প্রার্থীদের জয় পরাজয়ের পরিসংখ্যান ততটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। মধ্যপ্রদেশ-এ ২৯ জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে মাত্র আটজন জিততে পেরেছেন। ছত্তিশগড়ে দশজনের মধ্যে মাত্র চারজনই জয়লাভ করতে পেরেছেন। আর মিজোরামে একমাত্র মহিলা প্রার্থী জোথানকিমি পরাজিত হয়েছেন। দলের মহিলা প্রার্থীদের ভালো ফলে যথারীতি উল্লসিত কংগ্রেসের মহিলা শাখার সভানেত্রী প্রভা ঠাকুর। তিনি বলেছেন, 'এর ফলে আগামী লোকসভা নির্বাচনে ভালো সংখ্যায়

মহিলা প্রার্থীরা দলের টিকিট পাবেন। মহিলা প্রার্থীদের জয়লাভের অনুপাত পুরুষদের তুলনায় বেশি। মহিলারাও যে পুরুষদের তুলনায় কম নন তা তারা দেখিয়ে দিতে পেরেছেন। বরং মহিলারা পুরুষদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছেন।

মধ্যপ্রদেশ-এ সুন্দরমুখের জয়ে বিজেপিও পিছিয়ে নেই। বিজেপি মোট ২৩ জন মহিলা প্রার্থীকে ময়দানে নামিয়েছিল। তাদের মধ্যে ১২ জন জিতে এসেছেন। এমনকী রাজস্থানে, যেখানে দলে দলে বিজেপি প্রার্থীরা হেরেছেন সেখানেও দলের ৩২ জন মহিলা প্রার্থীর ১৪ জন জয়লাভ করেছেন। ছত্তিশগড়ে অবশ্য ছবিটা পাল্টে গেছে। দশজন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র তিনজনই জিতেছেন। বিজেপি'র মিজোরামে দুজন এবং রাজধানী দিল্লীতে তিনজন মহিলা প্রার্থীর কেউই জিততে পারেননি। অবশ্য বিজেপি মুখপাত্র প্রকাশ জাবড়েকর মহিলা প্রার্থীদের ফলে খুশী। তবে তিনি অসন্তোষ চেপে রাখেননি — বলেছেন, অন্যান্য দল আমাদের সমর্থন না করাতে সর্বস্তরে ৩৩ শতাংশ মহিলা প্রার্থী আবশ্যিক করার আইন বাস্তবায়িত হয়নি। মহিলা প্রার্থীদের এই সাফল্য আবার নতুন করে সর্বস্তরে ৩৩ শতাংশ মহিলাদের জন্যে সংরক্ষণের দাবিকে তুলে ধরবে, সামনে নিয়ে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। প্রকাশ জাবড়েকর-এর কথায় মহিলাদের জয়লাভের সামর্থ্য যে রয়েছে তা প্রশ্নাতীত।

প্রভা ঠাকুর-এর বক্তব্য, মহিলারা কর্মী হিসেবে কাজ করার পর যদি জানেন তাদের নির্বাচন লড়ার সুযোগ দেওয়া হবে না তাহলে তারা নিরুৎসাহিত হন। তবে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের পরই প্রার্থী ঠিক করা উচিৎ।

অনেক মহিলা প্রার্থীরা জয়লাভ করলেও কংগ্রেসের রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের মহিলা শাখার দুই সভানেত্রী মমতা শর্মা ও শোভা ওঝা ৫,২৬৪ এবং ১০,৭৪৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন। দিল্লীতে শীলার তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রীত্বে কোনও সন্দেহ নেই, তবে রাজস্থানে গিরিজা ব্যাস গেহলটকে হঠিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদ পেলেন না।

মণিপুরে মহিলা ফেরিওয়ালা

সংবাদদাতা ।। মণিপুরী মহিলারা শুধু ঘর-গেরস্থালির কাজেই নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যেও সমান দক্ষ। সম্প্রতি জানা গেছে যে, শুধুমাত্র রাজধানী ইম্ফলেই সরকারি পুর-পরিষদের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ফেরিওয়ালার সংখ্যা ২৩৯০৩ জন। এদের বেশির ভাগই মহিলা। এছাড়া অন্যত্র অন্যান্য স্থায়ী দোকানও মহিলারা চালান। তবে এঁরা বর্তমানে অসুবিধায় পড়েছেন। সম্প্রতি, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন সহ বিভিন্ন ভি ভি আই পি-দের বাসভবন লক্ষ্য করে উগ্রপন্থীরা বোমা নিক্ষেপ করে। সেজন্য রাজ্য সরকার রাস্তার পাশে ট্রলি নিয়ে যে সকল মহিলা ফেরিওয়ালা ব্যবসা করতেন তাদের প্রত্যেককেই উচ্ছেদ করেছে। ফেরিওয়ালা সংগঠনের পক্ষ থেকে সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়। তবে ২১১১ জন ফেরিওয়ালা বৈধ অনুমতি ছাড়াই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রলিতে যারা ফেরি করতেন তারা নিতান্ত দরিদ্র। ফেরিওয়ালা ব্যবসায়ী সংস্থার পক্ষ থেকে উচ্ছেদকৃত ফেরিওয়ালাদের জন্য বাজার এলাকায় স্থায়ী দোকান দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

শীতের মরশুমে উড়ে আসে পরিযায়ীরা

পরিযায়ী পাখির দল।

বিশেষ সংবদদাতা ।। সাঁতরাগাছির ঝিলে এখন পাখিদের ঝাঁক। ঝিলের যারা স্থায়ী বাসিন্দা সেই জলপিপি, ডাহুক, পানকৌড়িরা যেমন আছে তেমনি ঝিলের আতিথ্য গ্রহণ করতে চলে এসেছে অন্য রাজ্যের সরালের সঙ্গে বিদেশি বড় দিঘর, পিকিং হাঁস, খুন্তে হাঁসের মতো পাখিরা। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এদের কলরবেই মুখর সাঁতরাগাছির ঝিল। বনদপ্তর সূত্রে জানা গেল প্রতিবছর ছয় থেকে সাত হাজারের মতন পাখি সাঁতরাগাছির ঝিলে আসে। পাখিদের

পরিযায়ী পাখিরা আজ বিপন্ন প্রায় সব জায়গাতেই। দিন দিন বাড়ছে বিপন্নতা। পৃথিবী জুড়েই প্রকৃতি প্রেমিকরা আজ চোরা শিকারীদের হাত থেকে পরিযায়ী পাখিদের বাঁচাতে চেষ্টা করে চলেছেন নিরন্তর।

আশ্রয়স্থল এই সুবিশাল ঝিল দক্ষিণপূর্ব রেলের সাঁতরাগাছি রেল স্টেশনের ঠিক দক্ষিণ দিকে। ঝিলটির মোট জমির পরিমাণ দশ হেক্টর। এটি লম্বায় দেড় কিলোমিটার এবং চওড়ায় প্রায় পাঁচশো মিটারের কাছাকাছি। প্রায় কুড়ি বছর হল এই স্থানটিকে পক্ষিকুল তাদের আশ্রয় স্থল হিসেবে বেছে নিয়েছে।

আজ স্থানীয় মানুষজন এই পাখিদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। স্থানীয় মানুষজন বনদপ্তর এবং রেলদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে শীতের শুরুতেই এই ঝিলে অস্থায়ী ঘর বানানোর কাজ আরম্ভ করেছে। ইউরোপের নানা দেশ থেকেই এখানে আসে নাকাটা, কমনটিল, বড় দিঘর ও খুন্তে হাঁসেরা। ঝিলটির জায়গায় কিছু ছোট দ্বীপের মতন করা আছে। সেগুলি পাখিদের ডিম পাড়ার এবং বিশ্রামের স্থান। এইভাবেই দিন কাটিয়ে ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে আবার তারা ফিরতে থাকে নতুন ঠিকানায়। তবে স্থানীয় মানুষের মতে যে হারে বাকসাড়া অঞ্চ লের হাইড্রেনের নোংরাজল এই ঝিলের মধ্যে এসে পড়ছে তাতে কতদিন এই পরিযায়ী পাখিরা সাঁতরাগাছি ঝিলে আসবে তা সন্দেহের বিষয়।

শব্দদূষণ আর বেআইনি জমি দখলের জন্য এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম পাখিরালয় উত্তর দিনাজপুরের কুলিকে বিপন্ন পরিযায়ী পাখিরা। যদিও বর্ষার শুরু থেকেই এখানে পাখিরা আসে।

কুলিক পক্ষী নিবাসে পরিযায়ী পাখিরা প্রথম এসেছিল ১৯৮৫ সালে। সেবছর এসেছিল প্রায় ছত্রিশ হাজার পাখি। গতবছর সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় আশি হাজারের মতো। মূলত দক্ষিণ এশিয়া থেকে এখানে আসে বিল স্টর্ক, নাইট হেরন, হেরন, কর্মর‍্যাপ্ট , এগ্রেটসরা। পাখির সংখ্যা এখানে প্রতিবছর যেমন বাড়ছে তেমনিভাবে বাড়ছে না পক্ষিনিবাসের সুযোগ-সুবিধা। এর কারণ অনেক। প্রথমতপ্রতিবছর একটু একটু ভাঙছে কুলিক নদীর পাড়। পাড়ের সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য গাছ। তাছাড়া অভয়ারণ্যের বুক চিরে চলে গিয়েছে জাতীয় সড়ক। সারা দিন-রাত সেই সড়ক দিয়ে হাজার হাজার গাড়ি যায়। গাড়ির শব্দে ভীত সন্তস্ত্র পাখিরা। এছাড়া সরকারি বনজমিতে অবাধেই চলছে দখলদারি। এসব কারণে পক্ষিনিবাসের পক্ষিকুল আর থাকতে চাইছে না পাখিরালয়ে। তারা আশ্রয় নিচ্ছে রায়গঞ্জের বিভিন্ন ওয়ার্ডে। মিলনপাড়া, তুলসীপাড়া, রমেন্দ্রপল্লি, সুদর্শনপুরে এখন তাই অতিথিপাখির ভীড়।

পরিযায়ী পাখিরা আজ বিপন্ন প্রায় সব জায়গাতেই। দিন দিন বাড়ছে বিপন্নতা। পৃথিবী জুড়েই প্রকৃতি প্রেমিকরা আজ চোরা শিকারীদের হাত থেকে পরিযায়ী পাখিদের বাঁচাতে চেষ্টা করে চলেছেন নিরন্তর। এত সবের মধ্যেও বীরভূম জেলার একটি গ্রাম স্থাপন করেছে অন্য এক দৃষ্টান্ত।

গ্রামের নাম যজ্ঞনগর। বোলপুর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে এই গ্রামের বাসিন্দাদের বড় আদরের অতিথি এই পরিযায়ী পাখিরা। এখানকার পাখিদের চেহারা অনেকটা শামুক খোলের মতো। জানা গেছে এদের আদি বাসস্থান শ্রীলঙ্কা এবং তার আশপাশের কয়েকটি দ্বীপে। ভরা বর্ষার পর পরই এরা যজ্ঞনগর গ্রামের বেশ কয়েকটি বুড়ো তেঁতুল গাছে আশ্রয় নেয়। বছরের পর বছর এই গাছগুলিতেই বাসা বাঁধে এই পাখিরা। শীত শেষ হলে আবার তারা চলে যায়। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, এই পাখিরা আমাদের সৌভাগ্যের প্রতীক হয়ে গেছে। গ্রামের কেউ পাখিদের বিরক্ত করে না। তাদের মতে, যেহেতু পাখির সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন, তাই সরকার যদি এই গ্রামে একটি বনসৃজন প্রকল্প হাতে নেয় তাহলে ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক পাখি আসতে পারবে এই মরুদ্যানে।

আসা যাওয়ার এই পথ ধরেই দুধ সাদা ডানা মেলে হাজার হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ওরা আসে কেন্দুয়ার মাটিতে। ঝাড়গ্রাম থেকে জামবনি যাওয়ার পিচের রাস্তা ধারে দশ কিলোমিটার গেলেই কেন্দুয়া। গ্রামের ধারে যতীন্দ্রনাথ মাহাতোর ঘর। ঘরের পাশে কয়েকটি বড় তেঁতুল গাছের ডালে ডালে বাসা বাঁধে পরিযায়ী পাখির দল। গ্রামবাসীদের অনুমান প্রায় ১০০ বছর ধরে এই পাখিরা এখানে আসছে। গ্রীষ্মের কালবৈশাখীর প্রথম বৃষ্টি যখন সোঁদা গন্ধে ভরিয়ে দেয় চারপাশ তখন হাজারে হাজারে এই পরিযায়ী পাখিরা এখানে আস্তানা গাড়ে। আবার শীত থাকতে থাকতেই তারা চলে যায়। তবে চোরাশিকারীদের আক্রমণে পাখিদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন কেন্দুয়া গ্রামের অধিবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, আমরা অনেকবার বলেছি কিন্তু পরিযায়ী পাখিদের দেখভালের ব্যাপারে বন দপ্তর উদ্যোগী হননি।

শীতের পোশাক নিয়ে

সতীনাথ রায়

নীলুবাবু সেদিন শত চেষ্টা করেও ছেলেকে সোয়েটারের জন্য রাজি করাতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত পল্টুরটা বাদ দিয়েই পরিবারের বাকিদের জন্য শীত পোশাক কিনতে বাধ্য হলেন। বড় বড় শপিংমলে ঘুরেও পল্টু তার মনপসন্দ সোয়েটার পায়নি। অবশেষে হাতিবাগানের 'সিটি মার্ট' হয়ে ছেলের ইচ্ছাতেই হেদুয়া আসতে হয় তাদের। গাড়ি থেকে নেমেই পল্টু দৌড়ে ভুটিয়াদের কাছে পৌঁছে গেল।

নীলুবাবু ছেলের কীর্তিতে অবাক হলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। ঝা চক-চকে দোকানগুলো বাদ দিয়ে শেষে কিনা ভুটিয়াদের কাছ থেকে ছেলের সোয়েটার কেনার সখ হল। অবাক হয়েছিলেন নীলু বাবুর স্ত্রীও। পল্টুর বন্ধুরাও তো দোকান থেকেই সোয়েটার কিনেছে। তবে তার কেন এখানে কেনার ইচ্ছা — প্রশ্নটা নীলুবাবু নিজেই ছেলেকে করেছিলেন। ছেলের সোজা-সাপটা উত্তর — বাবা, ওসব পড়ে বুঝবো। আগে পছন্দ করতে দাও। মনের মতো জায়গা পেয়ে পল্টু তার পছন্দের সোয়েটার খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পাশ থেকে দাঁড়িয়ে সব কিছুই লক্ষ্য করছিলাম।

শীত পড়লেই ধরা বাঁধা ব্যবসায়ীদের মাঝে ভুটিয়াদেরও দেখা মেলে। বছরে তিন চার মাসের জন্য শীতের অতিথি রূপে ভুটিয়ারা আমাদের শহরে আসে। সাধারণত অক্টোবরের শেষের দিকে তারা রকমারি সব শীতের পোশাক নিয়ে হাজির হয়। আবার জানুয়ারির শেষের দিকে কিংবা ফেব্রুয়ারির প্রথমের দিকে তারা ফিরে যায়। যদিও তা শীতের তারতম্যের উপরই নির্ভর করে। ভুটিয়াদের এই কলকাতা শহরে ব্যবসা কীভাবে শুরু হল তা নিয়ে তেমন কোনও প্রামাণ্য দলিল পাওয়া যায় না। তবে শীতের পোশাক নিয়ে ভুটানীরাই প্রথম এই শহরে এই ব্যবসা শুরু করে। কিন্তু আজ আর তাদের দেখা যায় না। গত ৩০-৩৫ বছর ধরে ভুটানিদের জায়গাটা ভুটিয়ারা দখল করেছে। ভুটানের অধিবাসীদের মতোই দেখতে এরা। ভুটিয়া মূলত সিকিমের একটি উপজাতি। দেশের প্রতিটি প্রান্তেই বিক্ষিপ্তভাবে ভুটিয়াদের দেখতে পাওয়া যায়। তবে মেঘালয়, মিজোরামের দিকে এদের বসতি বেশি। শীতের শুরুতে ভুটিয়ারা শীতের

শীতের পোশাক নিয়ে হাজির শীতের

পোশাকের সম্ভার নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বড় বড় শহর, জেলা শহর ও রাজধানী শহরে একসাথে কিছু স্টল খোলে। তবে তা অবৈধভাবে নয়। প্রশাসনের ছাড়পত্র নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গার জন্য টাকার বিনিময়ে ভুটিয়ারা দোকান খোলার অনুমতি পায়। ভুটিয়ারা কিন্তু দোকান ছাড়া ফেরি করে শীত-পোশাক বিক্রি করে না। এখানে উল্লেখ্য , কাশ্মীরি পোশাক বিক্রেতারা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে শীতের পোশাকবিক্রি করে। অনেকক্ষেত্রে তারা আগে বিক্রি করে , পরে তার দাম নেয়। ভুটিয়ারা এ পথে কোনওদিনই হাঁটেনি। একসঙ্গে দল বেঁধে একটা বা দুটি নির্দিষ্ট স্থানে তারা স্টল

শীতের অতিথি নলেন গুড়

নবকুমার ভট্টাচার্য

নলেন গুড় শব্দটা পুরুষ বাচক এবং নলেন মানে নতুন। শীত এলে এই নতুন অতিথি আমাদের দুয়ারে হাজির হয়। শীতের খাবার-দাবার রীতি নীতি পুজো-আচার অর্থাৎ বাঙালির সংস্কারে ও নানা কর্মে জড়িয়ে রয়েছে নলেন গুড়। হেমন্তকালে নতুন ধান ঘরে এলে তা দেবতাকে উৎসর্গ করতে হয় যা নবান্ন নামে খ্যাত। এই নবান্ন কেবল নতুন ধানের চাল নয়, নতুন গুড়েরও। 'হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান' গ্রন্থে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'দেবতা অগ্নি কাক ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় স্বজনকে দিয়া গৃহকর্তা ও পরিবারবর্গ আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন গুড়সহ নতুন অন্ন গ্রহণ করিতেন।' গুড়ের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে রয়েছে — 'গুড়পায়স সপীংষি শঙ্কুল্যাপূপমোকান্। সংযাবদধি-সুপাংশ্চ নৈবেদ্যং মতিকল্পয়েৎ'॥ অর্থাৎ; গুড়, পায়েস, ঘৃত, শঙ্কুলী (লুচি) অপূপ (পিঠে) মোদক, সংযাব, দধি ও সূপ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করতে হবে। এমনকী ভবিষ্যপুরাণে প্রসাদ হিসেবে যে 'মন্ড' নামে খাবারের কথা বলা হয়েছে যা গুড় থেকে তৈরি। গুড় যে শুভ কারক তা উল্লেখ রয়েছে নানা শাস্ত্রে। এমন কি স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁর দুর্গাপূজা তত্ত্বম্ গ্রন্থে দেবিকে মধুর অভাবে গুড়দানের কথা বলেছেন। তবে এই গুড় আখের হতে পারে আবার খেজুরেরও হতে পারে। তবে বাঙালির ঘরে এই শীতের সময় চিরকাল পিঠেপুলির যে চল, তার সঙ্গে নলেন গুড়ের যোগ অবধারিত।

গুড়ের প্রথম রূপ হচ্ছে রস। খেজুর গাছের গলায়, যেখানে পাতা আরম্ভ হচ্ছে সেই নরম জায়গাটাকে কাস্তে দিয়ে চেঁচে একটা জিভের মতো গড়িয়ে পড়ার ছিলা কেটে তার নিচে হাঁড়ি বেঁধে রাখতে হয়। সন্ধ্যে নামার আগেই ওই হাঁড়ি বাঁধা হয়। সারারাত ধরে সেই হাঁড়িতে চুঁইয়ে পড়বে রস। যত বেশি ঠাণ্ডা পড়বে রসের কোয়ালিটি তত ভালো ও সুস্বাদু হবে। শীত ভাল করে না পড়লে রসও ভাল হবে না। কাকভোরে সেই হাঁড়ি নামিয়ে রস সংগ্রহ করতে হয়। এই রসের এমনই মহিমা সেই রস পান করে একেবারে আগমার্কা বিলেতি সাহেব মার্ক টুলি লিখে ফেলেছিলেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'দ্য গ্রেট রস'। খাঁটি রসের মাহাত্ম্য নিয়ে কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন —

খেজুর গাছে রসের হাঁড়ি টাঙাচ্ছে।

'হায়রে শিশির তোর কি লিখিব যশ
কালগুণে অপরূপ কাঠে হয় রস।
পরিপূর্ণ সুধাবিন্দু খেজুরের কাঠে।
কাঠ কেটে উঠে রস যত কাঠ কাটে।
দেবের দুর্লভধন জীবনের ঘড়া।
একবিন্দু রস খেলে বেঁচে ওঠে মড়া।।'

সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শীতের দিনের রস থেকে গুড় তৈরির প্রক্রিয়া নিয়ে গল্প 'রস' ১৩৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। রস হচ্ছে অমৃততুল্য। আট থেকে আশি সকলেরই প্রিয়। সংস্কৃত পণ্ডিত ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রস সমীক্ষা' গ্রন্থে বলেছেন, রসই সমস্ত কিছুকে অমৃতে পরিণত করে। বস্তুত আমাদের সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা রস নিয়ে তিন হাজার বছর ধরে অনেক আলোচনা করছেন। কাব্য ও নাটকের রস নিষ্পত্তির মূল সূত্র হিসেবে বলেছেন, বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাবের সংযোগে স্থায়ীভাব রসে পরিণত হয়। রসশাস্ত্রে আট প্রকার রসের কথা বলা হয়েছে। যা হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শৃঙ্গার। কাব্য প্রণেতারা শৃঙ্গার রসকে সচেতন ভাবে ব্যবহার করেছেন। কারণ শৃঙ্গার রস অনেকটা খেজুর রসের মতোই। ঠিকমতো প্রয়োগ না করলে শৃঙ্গার বীভৎস হয়ে ওঠে এবং খেজুর রস হয় ফেনা ওঠা তাড়ি। তাড়ি বলে দূর ছাই করলে চলবে না। কারণ কলকাতার বাজারেও শীতের দিনে তাড়ি বিক্রি হয়। হুতোম প্যাঁচা, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় তাড়ির প্রসঙ্গ রয়েছে। গ্রামগঞ্জে বিলিতি মদের বদলে তাড়ি এখনও বেশী জনপ্রিয়।

রস তাড়ি হয়ে ওঠার আগেই জাল দিয়ে গুড় বানাতে হয়। তবে তা গ্যাসের উনুনে হবে না, কাঠের উনুনের ধিকিধিকি আঁচে খেজুর রস জাল দিতে হয়। জাল দেওয়া গুড় আঠা আঠা হলে তা নামিয়ে রাখতে হয়। তবে পাকটা ঠিকমতো জানাই হলো আসল অভিজ্ঞতা। পাক বেশি বা কম হলে গুড় নষ্ট হয়ে যায়।

পাটালি তৈরি করার জন্য মেশাতে হয় চিনি। তবে লাল বাটা চিনি ব্যবহার করলে পাটালি সুস্বাদু হয়। জাল দিয়ে ঘন করা গুড় একটা ছড়ানো সরায় কাপড় পেতে ঢেলে ঠাণ্ডা করলেই জমে তা পাটালি তৈরি হয়। তবে পাটালি তৈরির নানা হ্যাপা রয়েছে। পাকের সময় কনকনে ঠান্ডা বাতাসকে আড়াল করতে হয়, না হলে গুড়ের আঠা ভাব কেটে যাবে।

আমাদের রাজ্যে সবচেয়ে বেশি খেজুর বা নলেন গুড় উৎপাদন হয় দুই ২৪ পরগনার নানা স্থানে। এরপর কমবেশী উৎপাদন হয় মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও বীরভূম জেলায়। এই খেজুর গুড় আবার দু'ধরনের চলন রয়েছে, একটায় ঝোলা বেশি আর একটা দানাগুড়। ঝোলা গুড়টা আবার কেবল দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বেশি পরিমাণে মেলে। জয়নগর এই জন্যই বিখ্যাত। নলেন গুড়ের মধ্যে এটাই কুলীন। অসামান্য স্বাদ ও গন্ধে এই গুড় ভুবন বিখ্যাত। তবে শীত যতদিন এই গুড়ের আয়ুও ততদিন। আর দানাগুড় বানানো হয় মূলত বসিরহাটে ও উত্তর ২৪ পরগণার নানা স্থানে। এই গুড়ের দাম অপেক্ষাকৃত কম। নদীয়া মুর্শিদাবাদ সহ কয়েকটি জেলায় এই গুড় বানানো হয়। এই গুড় কিছু বেশিদিন খাওয়ার উপযোগী থাকে। আখের গুড়ে ভিন প্রদেশের ব্যবসায়ীরা রাজত্ব করলেও নলেন গুড়ে বাঙালির একচ্ছত্র আধিপত্য। খেজুর গুড়, পাটালি, মোয়া বিক্রির ব্যবসায় বাঙালির সংখ্যা তাই দিন দিন বাড়ছে। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে এই নলেন গুড়কে ইংরেজদের কোপে পড়তে হয়েছিল। ব্যবসার বাড়বাড়ন্ত দেখে খেজুর রস ও নলেন গুড়ের ওপর ট্যাক্স বসিয়েছিল তারা। ঘটনাটা শুরু হয়েছিল কালিঘাটের হাটে। শীতের এক সকালে হাঁড়ি হাঁড়ি খেজুর গুড় নিয়ে বসেছিল হাটুরেরা। ওই সময় সেই স্থান দিয়ে ফিটনে করে যাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন ডেসমণ্ডবিয়র এবং তার প্রেমিকা। হাটের ভিড়ে গাড়ি আটকে গেল তাদের। প্রতিশোধে ট্যাক্স বসানো হয়েছিল শীতের অতিথির ওপর। সেই ট্যাক্স নিয়ে কবি ঈশ্বর গুপ্ত ব্যঙ্গ করে ছড়া কেটেছিলেন—

'আমাদের ভাগ্য দোষে মিছে করি দ্বেষ
বিজাতীয় রাজা হয়ে নষ্ট করে দেশ।
লোভকারী আবকারী যুক্ত করি কর
এমন খেজুর রসে বসাইল কর।
মাশুল উসুল করে রসে আর গুড়ে
পরে বুঝি গঙ্গাজলে কর দেবে জুড়ে।।'

তবে সেদিনের বাঙালিদের আন্দোলনের ফলে সরকার গুড়ের ওপর থেকে ট্যাক্স তুলতে বাধ্য হয়েছিল।

খেজুর গুড়ের ব্যবসায় পুরুষের আধিপত্য হলেও রস থেকে গুড় বানানো পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করে কিন্তু মেয়েরা। এ ব্যাপারে মেয়েদের থেকে পুরুষেরা পিছিয়ে। শীতের সময় কয়েক হাজার মেয়ে এই কর্মে লিপ্ত হয়। কারণ গুড় বানানোর জন্য চাই ধৈর্য্য আর পাকশালায় মেয়েদের ধৈর্য্য বেশিই থাকে।

১৮৮৩ সালে বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের 'পাকপ্রণালী' নামে রান্নার প্রথম মাসিক পত্রিকার মিষ্টান্ন পাক বিষয়ে নানা রেসিপিতে নলেন গুড়ের কথা রয়েছে। শীত এলে নলেন গুড় ছাড়া তাই বাঙালির রান্নাঘর অসম্পূর্ণ মনে হয়।

সরকারি হিসেব না থাকলেও বেসরকারি মতে গত বছর নাকি খেজুর গুড় মোয়া পাটালি মিলিয়ে একশো কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছিল। জয়নগরের মোয়া, পাটালি এবং নলেন এখন বিদেশেও পাড়ি জমাচ্ছে।

খোলে। মেলার আদলে যখন দোকানগুলি সাজানো হয় তখন বিভূতিভূষণের গ্রামীণ চিত্রই যেন মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

শহরে বা জেলায় বড় বড় দোকানের অভাব নেই, অভাব নেই শপিংমলেরও। তবু আজও এক শ্রেণীর মানুষ কিন্তু ভুটিয়াদের কাছ থেকেই শীতের বিভিন্ন পোশাক কিনতে পছন্দ করেন।

শপিংমলের ভিড়ে তাদের ব্যবসা কেমন চলে? প্রশ্নটা করেছিলাম কলকাতায় আসা অজয় তামাং নামে এক ভুটিয়াকে। উত্তরে তিনি বললেন, আমরা ব্যবসা করতে এসেছি। তাছাড়া আমরা নতুন নয়। আমাদের পোশাকের কোয়ালিটিই আমাদের কাছে বড় পরিচয়। তবে কোয়ালিটি বলতে এখানেও চিত্রটার বদল হয়েছে। ভুটিয়ারা আগে যে সোয়েটার বা শীত-পোশাক বিক্রি করত তা নিজেরাই তৈরি করত। এখন অবশ্য সেই পোশাক পাওয়া যায় না। এখন ভুটিয়ারাও কিনেই বিক্রি করছে। তারা যেহেতু উলের গন্ধটা ভালো বোঝে তাই কিনে বিক্রি করলেও সেখানে ভালো-মন্দের বিষয় একটা থেকে যায়। অনেক সময় দোকানে বিক্রি হওয়া পোশাকের সঙ্গে বা উলের সঙ্গে ভুটিয়াদের উলের মিল পাওয়া গেলেও, ভুটিয়াদের কাছে তার দাম কম থাকে। কারণ কী তার সুলুকসন্ধানে দেখা গেছে বড় বড় দোকানে বা শপিংমলে ট্যাক্সের ব্যাপারটা একটা বড় ব্যাপার। তাছাড়া দোকানের রেট সর্বদা ফিকস্‌ড থাকে। সেখানে শীতের পোশাক সেবছর বিক্রি না হলেও কিছু যায় আসে না। তবে ভুটিয়াদের ক্ষেত্রে চলতি বছরেই বিক্রি করে দেওয়ার মানসিকতা কাজ করে। ফলে লাভ বেশি না রেখেই তারা বিক্রি করে দিতে চায়। তাছাড়া রকমারি সম্ভার থাকায় থার্ড জেনারেশনের যুগেও মাঝ বয়সীদেরও সেগুলি আকৃষ্ট করে। তবে সে ধরনের খরিদ্দার কম। অজয় তামাং-এর নিজের মতে — বাচ্চাদের পোশাকই তাদের বেশি বিক্রি হয়। আবার অনেকে গ্রাম থেকে শহরে কোনও কাজে এসে, তাদের কাছ থেকে কিছু কিনে ফিরে যায়। এক্ষেত্রে রথ দেখা কলা বেচা দুইই হয়। যদিও এদের সংখ্যা খুবই কম। গ্রামে পোশাক বিক্রির ক্ষেত্রে কাশ্মীরি শাল বিক্রেতারা বেশি বাজার করেছে।

আজ গ্লোবালাইজেশনের যুগে ভুটিয়াদের সুখের কারবারে কালো ছায়া দেখা দিয়েছে। অনেক ভুটিয়াই এই ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। শীতও এখন গ্লোবালাইজেশনের জন্য কম। ফলে শীতকেন্দ্রিক ব্যবসা থেকে তারা সরে যাচ্ছে। যারা দু'চার মাসের জন্য যারা কোমরে গামছা বেঁধে নামে তাদেরও এটাই রুটি রুজির একমাত্র সম্বল নয়। নিজেদের দেশে (গ্রামে) একটা নির্দিষ্ট ব্যবসা বা চাষ-বাসের কাজ আছে।

এদিকে পল্টুও তার পছন্দ মতো হাতকাটা সোয়েটার পেয়ে গেছে। বাড়ি ফেরার সময় পল্টু শুধু বলল, থ্যাঙ্ককিও ভুটিয়া অ্যাঙ্কেল।

ভুটিয়া অ্যাঙ্কেলরা হয়তো আর বেশিদিন থাকবে না। কিন্তু তাদের কপালে যে চিন্তার ছাপ জমেছে তার কী হবে। তাদেরকে আমরা হারিয়ে ফেলব না তো?

অরণ্যের অধিকার

'মাটি-জল-জঙ্গল'-এর সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত তারাই সাধারণত আদিবাসী নামে পরিচিত। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে যারা আদিম অধিবাসী হিসেবে স্বীকৃত। বন-জঙ্গলে বসবাসের কারণে তাদের বনবাসীও বলা হয়ে থাকে। প্রধানত চাষাবাদ ও পশু-পাখি শিকারই তাদের মূল উপজীবিকা। তাই 'অরণ্যের অধিকার' তাদের জন্মগত। তাদের রয়েছে নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতি। কিন্তু শিক্ষার আলো থেকে তারা চিরবঞ্চি ত। আর্থিকভাবেও তারা পশ্চাৎপদ। উন্নয়ন তদের কাছে 'সোনার পাথর বাটি'।

আদিবাসীরা খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ। আর এই সারল্যের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর ক্ষমতাবান মানুষ যুগ যুগ ধরে তাদের উপর চালিয়ে আসছে বঞ্চ না, শোষণ ও নির্যাতনের স্টিম রোলার। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকরাও তাদের প্রতি ছিল না সুপ্রসন্ন। প্রতিনিয়িত তারা হয়েছে তাদের অকথ্য বঞ্চ না, গঞ্জনা, শোষণ ও নির্যাতনের শিকার। শবররা'তো তাদের কাছ থেকে পেয়েছে 'অপরাধ প্রবণ' জাতির তকমা। তাই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তারা উড়িয়েছিল বিদ্রোহের ধবজা। ইতিহাসে যা 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। স্বাধীনতা সংগ্রামেও তাদের অবদান অনস্বীকার্য। বীরসা মুন্ডা ছিলেন এমন এক স্বাধীনতা সংগ্রামী যিনি বনবাসীদের প্রতি ইংরেজদের সার্বিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন। বহু বিপ্লবীও হারিয়েছেন প্রাণ। তাঁদের বীরত্বের কাহিনী আজ প্রায় বিস্মৃত।

স্বাধীনোত্তর ভারতে বিশেষত পশ্চি মবঙ্গে জনজাতিদের ভাগ্য আজও ফেরেনি। কংগ্রেসের তিরিশ বছর এবং বামফ্রন্টের একত্রিশ বছরের শাসনে তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। বরং সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের প্রবক্তা বামমার্গীদের শাসনে তারা হয়েছে আরও গরীব, আরও বেশী বঞ্চি ত, শোষিত ও অত্যাচারিত। আজও তারা শিক্ষা, চিকিৎসা, চাকরি, উন্নতি, অগ্রগতি তথা ন্যায্য পাওয়া থেকে বঞ্চি ত। তাই বঞ্চ নার বিরুদ্ধে ও অত্যাচারের হাত থেকে নিস্তার পেতে তারা যখন আন্দোলনের পথকে নিয়েছে বেছে, তখনই তাদের গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে মাওবাদী ছাপ। আর তাদের ধরতে বুদ্ধ বাবুর পুলিশ জঙ্গলমহলের নিরীহ আদিবাসীদের উপর চালাচ্ছে অমানবিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন। ফলে ক্ষুব্ধ, বঞ্চি ত ও নির্যাতিত জনজাতিদের সরকার বিরোধী আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে সারা রাজ্যে। লালগড় হয়ে উঠেছে বিদ্রোহের লালদুর্গ। তাই রাজ্য সরকার কালক্ষেপ না করে অবিলম্বে সমস্যা সমাধানে তৎপর না হলে, আন্দোলন যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

মুসলিম নিয়ে রাজনীতি

লোকসভা নির্বাচন আসছে। এই আগমনী বার্তা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ই শুরু হয়ে গেছে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করার রাজনীতি। চলছে তাদের জন্য উন্নয়ণের বাহারী প্রচার অভিযান। এমনকি মুম্বাই শহরে ভয়ঙ্কর মুসলিম সন্ত্রাসবাদী অভিযানের দিনেও আমাদের পশ্চি মবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য মহাশয়ের বক্তব্য একমাত্র হিন্দু-মুসলিম উন্নয়ণের সমতা বজায় রেখেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে প্রতিহত করা যায়। শাসক দলগুলোর এমন নানারকম প্রলোভন দেখে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মুখেও দেখা যায় মুচকি হাসি। কারণ অতীতেও তারা দেখেছে এমন আরও অনেক নির্বাচনী নাটক। এইসব দলীয় মহারথীগণ হয়তো জানেই না মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ অত্যন্ত সংগঠিত। ইমামের নির্দেশ ছাড়া তারা কোনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে না। তাদের সামাজিক শিক্ষা এবং শিষ্টাচার এমনই যে, নির্বাচনে তাদের ধর্মীয় নেতাদের নির্দেশ ছাড়া কখনও কোনও অমুসলিম সম্প্রদায়ের লোককে ভোট দেবে না। রাজনৈতিক কূটকৌশলে তারা বিভিন্ন দলের সঙ্গে মিশে যায়;কিন্তু মুসলিম ধর্মীয় মতাদর্শ মেনেই ভোট দেবে শুধু মাত্র মুসলিম প্রার্থীকে।

শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা।

।। ২ ।।

ব্যাঙ্গালোর-আমেদাবাদ-দিল্লী-র পর আবার মুম্বই-এ হামলা। মুম্বইতে সি এস টি প্লাটফরম চত্বরে, নরিম্যান হাউসে, ওবেরয় ও তাজ হোটেল গ্রেনেড, এ কে ৪৭, এ কে ৫৬ নিয়ে ভারতীয় ও বিদেশীদের হত্যা করে পাক-জঙ্গিরা যে ভাবে তান্ডবলীলা চালাল, তার ফলে স্বভাবতই মনে হওয়া স্বাভাবিক আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কত ঠুনকো। এ ভাবে জঙ্গিদের দ্বারা মানুষ খুন, সম্পত্তির ক্ষতি ও জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়াতেও কিন্তু আমাদের দেশের নেতা-মন্ত্রীরা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে শুধু বিষোদগার করেই ছেড়ে দিয়েছেন। সারা পৃথিবীতে জঙ্গি মানেই যে তারা মুসলমান একথা ১১।৯, ২৬।১১-র ধবংসলীলা বিশ্লেষণ করলেই জানা যাবে। আমাদের দেশ ও দেশের প্রায় প্রতিটি রাজ্যই বিশেষ করে পশ্চি মবঙ্গ সংখ্যালঘু তোষণ করে দেশকে আজ বারুদের স্তুপের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সংখ্যালঘুদের কিছু বলা যাবে না তাহলে ইমাম রাগ করবে আর তার প্রভাব পড়বে নির্বাচনের ভোট বাক্সে।

কিন্তু প্রশ্ন, এতগুলি লোক পাকিস্তান থেকে এলো, অতোগুলো রাইফেল অত গ্রেনেড নিয়ে এসে তাজ হোটেলে জড়ো করলো, কোনও নিরাপত্তা রক্ষী, উপকূল রক্ষীদের নজরে এলো না! হোটেলে তারা কয়েক মাস অবস্থান করলো কিন্তু মহারাষ্ট্র পুলিশ তা জানতে পারলো না। হয়তো বা তারা তখন উপকূলের দোকানে তোলা তুলতে ব্যস্ত! মহারাষ্ট্র ফর মহারাষ্ট্রিয়ান কোথায় গেল? উত্তর ভারতের ও বিহারের পরীক্ষার্থীদের যেভাবে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল, বীরপুঙ্গব পুলিশ বাসের মধ্যে যেভাবে বিহারী যুবককে গুলি করে হত্যা করেছিল, বর্তমানে জঙ্গি দমন করতে তারা কোথায় গেল। তখন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কমান্ডোদের ছাড়া অপারেশন করতে পারলো না কেন?

যাই হোক, ভারতের হাতে এখনও সময় আছে এবং প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের সহমত হওয়া উচিৎ — আর সংখ্যালঘু তোষণ নয়। ভারতে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের মধ্যে বেশির ভাগই পাকিস্তান পন্থী, সেটা ভারত -পাকিস্তান কোনও খেলা থাকলে ভালই বোঝা যায়। বুদ্ধ দেববাবু তো একবার সত্যিকথাটা মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন, 'মাদ্রাসাগুলি জঙ্গীদের আস্তানা'। পরে আবার পলিটব্যুরোর ধমকে নিজের থুতু গেলার মতো কথাটা তুলে নেন।

এ ভাবে চললে পাকিস্তান সুযোগ বুঝে ভারতের কোনও নেতা মন্ত্রীর মেয়েকে অপহরণ করে পণবন্দী হিসাবে আফজল ও আজমলকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে ঠিক যেভাবে আজহার মাসুদকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং দন্ড প্রাপ্ত জঙ্গি দের ফাঁসি দিয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিৎ।

খুবই দুঃখের সহিত জানাই, বর্তমান নপুংসক সরকারের দ্বারা তা হবে না। বুদ্ধ দেবজায়া তো মিছিল করেছিলেন ধনঞ্জয়কে ফাঁসী দেবার জন্য। অথচ জঙ্গি আফজল ও আজমলকে ফাঁসী দেওয়ার জন্য করবেন না। কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম কেউই জঙ্গিদের ফাঁসীর জন্য সরব হতে পারবে না। কারণ এদের কাছে আগে গদী, পরে অন্যকিছু।

দেবীপ্রসাদ সরকার, মেমারী, বর্ধমান।

।। ৩ ।।

আমি স্বস্তিকার নিয়মিত পাঠক, পূর্ববঙ্গীয় হয়েও বলছি, হিন্দু কমিউনিস্ট নেতারা আশ্রয় পাওয়া পশ্চি মবাংলাটাকে শেষে দেখছি মুসলিম রাজ্যেই পরিণত করবে। ভোটের স্বার্থে ক্ষমতার লোভে বীর শ্যামাপ্রসাদের পশ্চি মবাংলাটাকে জ্যোতি-বুদ্ধ রা মহামেডানদের হাতে তুলে দেওয়ার যেন শপথ নিয়েছে। যেখানে বাংলাদেশের তিনটে জেলা ফেরত চেয়ে আন্দোলন লড়াই করার কথা সেখানে মুসলিম-প্রেমী সি পি আই (এম) মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও নদীয়া জেলাকে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সাথে মিশিয়ে দেওয়ার পথে যেন এগোচ্ছে। অতীতে মুসলিম লিগের সাথে হাত মিলিয়ে আমার জন্মভূমি পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশকে পাকিস্তানে পরিণত করেছে এই কমিউনিস্টরা। এ ব্যাপারে অবিলম্বে আর এস এস, বি জে পি, বজরঙ্গদল, শিবসেনা আন্দোলনে নামুক। এপার বাংলাকে বাঁচাতে কমিউনিস্টদের জারি জুরি শেষ করুন।

নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য, আতপুর, শ্যামনগর, উঃ ২৪ পরগনা।

অভ্যন্তরীণ সঙ্ক ট থেকে মুক্তি পেতেই সন্ত্রাসে মদত পাকিস্তানের

এন সোম

সদ্য সদ্য মুম্বাইতে জঙ্গি হানার পর সন্ত্রাস নিয়ে খুব চর্চা চলছে।

এমন জঙ্গি সন্ত্রাসের পেছনে যে কারণগুলি কাজ করে — (১) আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিক অবিচারের দরুণ উন্মত্ততার প্রকাশ। (২) কিছু অপরাধী ক্রমে ক্রমে পেশাদার অপরাধীতে পরিণত হয় এবং তাদেরকে এই জঙ্গি সন্ত্রাসের কাজে লাগানো হয়। (৩) ক্রুসেডার জঙ্গি — কোনও একটি মতবাদ বা প্রতিষ্ঠা করার জন্য জঙ্গি সন্ত্রাস। (৪) রাষ্ট্র কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত সন্ত্রাস—কোনও রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষিত পৃষ্ঠপোষিত জঙ্গিদের সন্ত্রাসবাদী কাজে লাগানো।

মুম্বাইয়ের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে জওয়ানসহ বহু মানুষজনের মৃত্যু হয়েছে। ১৯৯৩-এ মুম্বইয়ের লাগাতার বিস্ফোরণেও বহু মানুষের জীবননাশ হয়েছিল। কিন্তু সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পুলিশ এবং প্রশাসন বার বার ব্যর্থতার নজির রেখেছে। ব্যাঙ্গালোর, আমেদাবাদ দিল্লী ত্রিপুরা ও অসমেও ঘটে গেল সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ। এর বিরুদ্ধে নেতা-মন্ত্রীদের বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ কোনওদিনই দেখা যায় না। এর থেকে সাধারণ মানুষ মনে করতেই পারে হয় সরকারের ক্ষমতা নেই, কিংবা সন্ত্রাস রোখার ইচ্ছাই নেই?

ভারতের মাটিতে বারে বারে যে সন্ত্রাসী আক্রমণ ঘটেছে, তার উৎস যে পাকিস্তানেই এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদ দমন করার নামে মার্কিন সরকারের প্রভূত সাহায্য নিয়ে নিজেদের দেশে সন্ত্রাসীদের সযত্নে গড়ে ওঠার ব্যবস্থা করেছে। এই দ্বিচারিতা থেকে পাকিস্তানকে সরে আসার দাবি সমগ্র বিশ্বকে করতে হবে।

সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে ভারত এখন অতীতের চেয়ে অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। উপ-মহাদেশীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে মার্কিন নীতির মৌখিক হলেও পরিবর্তন-এর কথা শোনা যাচ্ছে। পাকিস্তানের জিগরি -দোস্ত হোয়াইট হাউস এখন ভারতের সঙ্গে

জ ন ম ত

সম্পর্কে উন্নতি ঘটাতে চায়। পারমাণবিক চুক্তি দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত করেছে। পাশাপাশি সামরিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতাও উপমহাদেশে শক্তির ভারসাম্য অনেকটাই বদলে দিয়েছে। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে পাকিস্তানের ভূমিকাকে মোটেই পছন্দ করছে না আমেরিকা। মুম্বইয়ের ঘটনায় মার্কিন বিদেশ সচিব কন্ডোলিজা রাইজের ভারত ও পাকিস্তান সফর বুঝিয়ে দিয়েছে, মার্কিন দেশ পাকিস্তান এবং তাদের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে কঠোর অবস্থান নিতে চায়। সন্ত্রাসবাদ দমনে পাকিস্তান যাতে ভারতকে সহযোগিতা করে সে কথা কন্ডোলিজা বলেছেন। এতসবের পরে কার্যত পাকিস্তান ভারতের দাবিগুলিকে কতটা মানবে সেটাই এখন দেখার। অন্যদিকে সন্ত্রাস নিয়ে পাকিস্তানের পাশে চীন কিন্তু আগের মতো দাঁড়াবে না।

ভারতের উপর পাকিস্তান তিনটে যুদ্ধ — '৬৫, '৭১, '৯৮ চালিয়েছিল। ভারত কাবু হয়নি। তাই এবার জঙ্গি ঘাঁটিগুলি বিনাশ করার উদ্যোগ নেওয়া দরকার। কাশ্মীর থেকে ভারতের সীমান্তপারে যে ৯৭টি জঙ্গি ঘাঁটি আছে তা গুঁড়িয়ে দেওয়া দরকার। এর সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে ভারতের সহযোগিতা আনার জন্য কূটনৈতিক কার্যকলাপ লাগাতার চালাতে হবে। বিপদের সময়েই বন্ধু চিনবে ভারত। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব পাক-প্রেসিডেন্ট জারদারির সঙ্গে কথা বলেছেন। তাই ভারতকেও কূটনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে। আসলে পাকিস্তানের শাসকরা তাদের দেশের মানুষের সমস্যা মেটাতে ব্যর্থ হয়ে এই সন্ত্রাসে উৎসাহ দিয়ে নিজেদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে চায়।

আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখছেন ডঃ চন্দ্রভূষণ শর্মা।

বর্ধমানে 'শিক্ষা সংস্কৃতি উত্থান ন্যাস'-এর আলোচনাসভা

প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত রাজনীতি মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর স্বপক্ষে জোরালো আবেদন জানালেন ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ চন্দ্রভূষণ শর্মা। তিনি আরও বলেন, এজন্য প্রকৃত শিক্ষাবিদ দিয়েই শিক্ষা ব্যবস্থা সঞ্চা লন করা উচিত। গত ২৩ নভেম্বর 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি উত্থান ন্যাস' বর্ধমান চ্যাপ্ট ারের উদ্যোগে বর্ধমান লোকমঞ্চে আয়োজিত শিক্ষায় স্বায়ত্তীকরণ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে এসে তিনি এমন মন্তব্য করেন।

ন্যাসের আহ্বায়ক সমীর রাউত ডঃ শর্মার প্রস্তাব সমর্থন করেন। এদিন বাদামতলা বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় বেশ কয়েকটি সংস্থা উপস্থিত ছিল।

বারাসাতে ভাগবত সম্মেলন

বারাসাত ভাগবত সমাজের উদ্যোগে গত ১৭ থেকে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল তৃতীয় বার্ষিকভাগবত সম্মেলন। প্রত্যেক বছরের মতো এবারও নগর সংকীর্তন, ধর্মীয় শোভাযাত্রা এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই সম্মেলনের শুভ সূচনা হয় বারাসাত নতুনপুকুর ভলিবল ময়দানে।

এই আট দিনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আলোচনা সভা, গীতা মহাযজ্ঞ, ভক্তিগীতি, ভজন-কীর্তন ছাড়াও দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থার বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ বহু বিখ্যাত ব্যক্তিরা এই সম্মেলনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

স্বদেশী মত, স্বদেশী পথে যে চার্চে হয় খৃস্টের উপাসনা

সোমনাথ নন্দী

বিষয়টি যে কোনও গোঁড়া খৃস্ট ধর্মাবলম্বীকে চমকে দেওয়ার মতো। অন্তত যাঁরা নিজের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে ভালবাসেন। যাঁরা ভাবেন তাঁদের উপাসনায় ভ্যাটিকান বা প্রোটেস্টান্ট চার্চ অথরিটির নিদানই শেষ কথা — তাঁদের প্রদর্শিত পথেই আসতে পারে ধর্মজীবনের সাফল্য। কিন্তু

পরম্পরা

তামিলনাড়ুর বেলাঙ্গনি চার্চের উপাসনা পদ্ধতি দেখে বা শুনে তাঁরা অবশ্যই ভাববেন- এও কী হয়! ভারতীয় প্রথায় লর্ড ক্রাইস্টের উপাসনা — এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃপক্ষ কীভাবে মেনে নিচ্ছেন এ প্রথা।

যতই অবাস্তব মনে হোক, এটাই কঠিন বাস্তব বেলাঙ্গনি চার্চের ক্ষেত্রে। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় বিশেষত সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত হাজারে হাজারে ধর্মপ্রাণ খৃস্টান নরনারী ধেয়ে আসেন বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী এই উপাসনালয়ে — তখন মনে হয় এই হল ভারতবর্ষ। যে দেশ সমস্ত মত পথকে আত্মীকরণ করে নেয়। তাদের আপনভাবে বিকশিত করে। তাদের উদ্বুদ্ধ করে নিজস্ব জীবনাদর্শে।

প্রায় ৪০০ বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্বের বিভিন্ন শতাব্দীর বহু ৮০ পেরেনো মানুষ দেখেছেন, দেখে এসেছেন সে দৃশ্য। চলেছেন অসংখ্য ধর্মপ্রাণ খৃস্টান মানুষ সমুদ্র তীরবর্তী উক্ত চার্চ অভিমুখে। শরীরে তাঁদের গৈরিক বেশ, হাতে কাঠের যষ্ঠি, আর কণ্ঠে ভগবান যিশু ও মা মেরীর উদ্দেশ্যে দেশীয় ভাষায় স্তুতি গান। মস্তক মুন্ডন করছেন অনেকে। তারপর সমুদ্রে করছেন স্নান। অনেকে নগ্নপদে বা দন্ডি কেটে এগিয়ে চলেছেন শ্বেত শুভ্র সেই চার্চের দিকে। বহু মানুষের হাতে রয়েছে পিতলের থালায় নারকেল, জুঁইফুল ও কর্পূর। পূজার উপাচার হিসাবে। বলা বাহুল্য খৃস্ট ভক্তদের এই প্রথাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন খৃস্টান যাজকবর্গ। কথা হল ভারতের অন্যান্য চার্চে যখন কঠোরভাবে খৃস্টীয় আচার পদ্ধতি মানা হয়, বেলাঙ্গনি কেন ব্যতিক্রম। সে প্রসঙ্গে আসি এবার।

ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জানেন ভারতে খৃস্টধর্মের প্রবেশ ১৫১০ খৃস্টাব্দে। পর্তুগীজ পাদ্রিগণ ছিলেন তার পথিকৃত। তাঁদের ও পরবর্তীকালে অন্যান্য ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টায় গীর্জা সংস্কৃতি বিস্তৃত হয় এদেশে ব্যাপকভাবে।

সাধারণত গীর্জাগুলি ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে নিজস্ব ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেন। কিন্তু বেলাঙ্গনির ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়ে চলেছে ভারতের নিজস্ব কৃষ্টির সাথে ক্যাথলিক পন্থায়

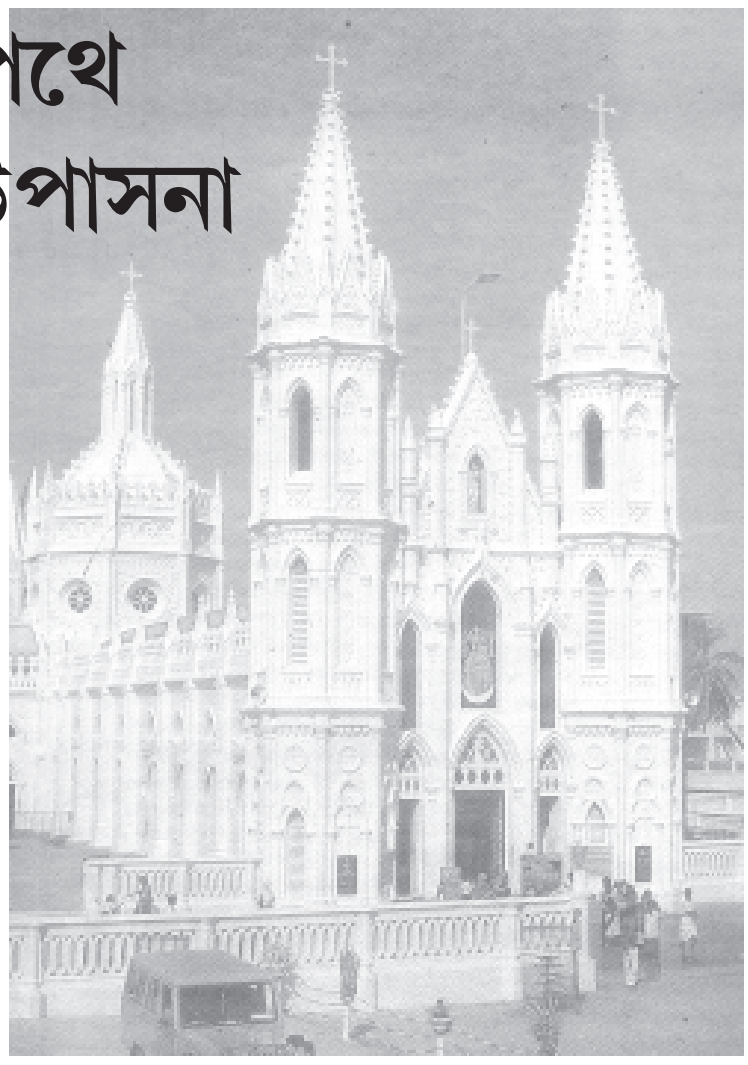

বেলাঙ্গনি চার্চ

বিস্ময়কর সমন্বয়। উৎস যার কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা।

প্রথম ঘটনা ১৫৬০ খৃস্টাব্দের পটভূমিতে। বেলাঙ্গনি তখন তামিলনাড়ুর এক গন্ডগ্রাম। গ্রামের একটি রাখাল বালক প্রতিদিনের মতো মেষের পাল নিয়ে বেরিয়েছিল কাকভোরে। সঙ্গে থাকত বড় একটি পাত্রে দুধ। সারাদিনের খোরাক। চারণক্ষেত্রটি গ্রামের শেষভাগে। প্রতিদিনের মতো ভেড়াগুলিকে ইচ্ছা মতো চরতে দিয়ে, নিজে উঁচু একটা ঢিবিতে বসে সতর্কভাবে লক্ষ্য রাখত তাদের। সেদিনও ব্যতিক্রম ঘটেনি।

নজরদারির মাঝে হঠাৎ সে যেন ডুবে যায় স্মৃতির অতলে। দারিদ্র্য যে মানুষের জীবনকে কতটা ওলট-পালট করে দিতে পারে, ছোট্ট জীবনে সে হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছে। বীভৎস সব স্মৃতি তাঁকে মুহূর্তে ছুঁড়ে দেয় অবসন্নতার গভীরে। ভারি হয়ে আসে চোখের পাতা। হঠাৎ—

একটু দুধ দেবে বাছা। কোলের ছেলেকে দেব। বড় ক্ষুধার্ত সে — কথাগুলি কানে যেতেই সপ্রতিভ হয়ে ওঠে রাখাল। সামনে দেখতে পায় বিদেশিনী এক মহিলাকে। সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তি। সারা শরীরে যেমন লাবণ্য, তেমনি করুণার ঢল।

ভাবে রাখাল, এঁকে তো কখনও এ গ্রামে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সে। আবার সেই এক আবেদন মহিলার — একটু দুধ দেবে! এবার সম্বিত ফিরে পায় ছেলেটি। নিজের সব দুধ দিয়ে দেয় বিদেশিনীকে। যাবার সময় মহিলা জানিয়ে দেন নিজের পরিচয়। তিনি মাতা মেরী। শিশুপুত্র যিশুর জন্যই তাঁর দুধ সংগ্রহ।

ঘটনাটি ছেলেটিকে হতবাক করে দেয়। সে দিনের মতো মেষ চরানো বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি ফিরে যায় মনিবের বাড়িতে। মনিব খৃস্টভক্ত, ধর্মপ্রাণ। শুনে পুলকিত তিনি। জানান ঘটনাটি তিনি গ্রামে। গ্রামের অন্যান্য খৃস্টভক্তদের সাহায্যে গড়ে তোলেন খড়ের ছাউনি দেওয়া একটি চ্যাপেল বা উপাসনা ঘর দর্শনস্থলে।

পরের ঘটনা একটি পঙ্গু কিশোরকে ঘিরে। সেও দর্শন পায় ওই স্থানে মা মেরীর। তাঁর কৃপায় অলৌকিকভাবে ঘটে যায় ছেলেটির পঙ্গুত্ব মুক্তি। এরপর চ্যাপেলটি

(এরপর ১২ পাতায়)

শ্রীসারদা কথামৃত

নন্দলাল ভট্টাচার্য

কথা কখনও শুধুই কথা। আবার কখনও বা হয়ে ওঠে বাণী। অনেকটা বর্ণালী কাঁচের মতো। কয়েকটি শব্দ হয় অনন্ত বাক্যের সমহার। ব্যঞ্জনায় বহু মাত্রিক। বক্তব্যে সরস — তাৎপর্যপূর্ণ। তত্ত্বের মহিমায় মহীয়ান। কথা তখন অমৃত সমান।

রামকৃষ্ণের কথার মধ্যে ছিল তেমনই দ্যুতি। তাঁর মুখের কথা তাই কথামৃত। রামকৃষ্ণের মতোই, কখনও বা তাঁর চেয়েও অর্থবহ, বহুমাত্রিক বাক্যের ছটা স্ফুরিত হয়েছিল জননী সারদার অধরে। একেবারেই আটপৌরে — অথচ কী আকর্ষণীয়, কী অর্থবহ। রামকৃষ্ণের কথায় উপমার বিভা দেখে কেউ কেউ তুলনা করেন কালিদাসের উপমার সঙ্গে। কিন্তু দেবী সারদার কথায় ছিল দৈনন্দিন জীবন থেকে নেওয়া শব্দ ও বাক্যের যে ঝনক, তা যেন অনেকটাই কোমল হীরের ছটার মতো। শান্ত, স্নিগ্ধ অথচ আলোকময়, বর্ণময়।

চাঁদকে নিয়েই তিনি শুনিয়েছেন কত না কথা। সেসব কথার মধ্যে যেমন রয়েছে বৈদান্তিক তত্ত্বের আভাস, তেমনি আছে গূঢ় তত্ত্বেরও প্রকাশ। রামকৃষ্ণ বলতেন চাঁদ মামা, সকল শিশুর মামা। ঈশ্বরও তাই।

রামকৃষ্ণের সেই তত্ত্বকথাকেই আরও সহজ করে জননী বললেন, একই চাঁদ রোজ রোজ। সব অবতারের মধ্যেই রয়েছেন সেই একই ঈশ্বর। এ যেন গীতার সম্ভবামি যুগে যুগে-এর এক নবভাষ্য।

সেই ঈশ্বরকে দেখতে হলে, তাঁর অস্তিত্ব বা করুণাকে অনুভব করতে হলে অপেক্ষা করতে হয় সুবাতাসের জন্য। শরৎ আকাশেও মেঘে ঢাকা পড়ে চাঁদ। কখনও মনে হয়, বুঝি নেই চাঁদ। তারপর বাতাসের ভেলায় চেপে মেঘ যেই যায় সরে, অমনি দেখা দেয় আবার সেই চাঁদ।

চাঁদ, মেঘ, বাতাস — এই তিন উপমাকে সামনে রেখে দেবী সারদা বলল, 'আকাশে চাঁদটি মেঘে ঢেকেছে। ক্রমে ক্রমে

।। শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে প্রকাশিত।।

হাওয়ায় মেঘটি সরে, তবে তো চাঁদটি দেখতে পাবে। কম করে কি কী যায়? এও তো তেমনি'। সোজা কথায়, ঈশ্বর আদেশ, কখনও পূর্ণ প্রকাশ, কখনও বা মেঘে ঢাকা। ঢাকা কিন্তু সাময়িক। বাতাস বইলেই সরে যাবে তা।

চাঁদ সুদর্শন। চাঁদের আলোয় ঘোচে অন্ধকার। তাই বুঝি তাকে পাবার অত আগ্রহ। এমনকী সুরূপেরও প্রার্থনা, মুখটি হোক চাঁদের মতো। কিন্তু সেই চাঁদের বুকেও আছে কলঙ্ক। আর তাই মা সারদা যখন দক্ষিণেশ্বরের নহবতখানায় এক কঠিন সাধনায় রত, তখন তাঁর একটিই প্রার্থনা, 'চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে — আমার মনে যেন কোনও দাগ না থাকে।'

এ এক অপূর্ব প্রার্থনা। এ চাওয়ার মধ্যে আছে এমন এক আকুতি, যা সহজেই নাড়া দেয় মনকে। এ আকুতি নিষ্কলুষ হওয়ার, কামনা বাসনা, লোভ লালসা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ার। নির্বাসনা হবার আর্তিতে একটি পবিত্র জীবনের উদ্ভাস রয়েছে এ প্রার্থনায়।

চাঁদ-এর তুলনা চাঁদ। তাই বোধ হয় ঘুরে ফিরে মা সারদার কথায় বারে বারে এসেছে চাঁদ। আশ্চর্য প্রতিবারেই তা হেসে উঠেছে নতুন ভাবে, নতুন রূপে, নতুন ব্যঞ্জনায়। বিধুজনের উক্তি, 'শ্রেষ্ঠ উপমার গুণ অনিবার্যতা'। সারদামণির কথায় কথায় যে উপমার ব্যবহার, তার মধ্যে দেখা গেছে সেই অনিবার্যতারই স্বভাব-প্রকাশ। আর তাই তো মায়ের কথা — মায়েরই কথা। অমৃতমাখা।

ঈশ্বর সকলকে করুণা করেন। কখন, কীভাবে —তা তিনিই জানেন। তাই অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষা করতে হয় শরণাগত হয়ে। সময় হলেই তিনি টেনে নেবেন কাছে। চাই অচঞ্চল চিত্ত, চাই স্থির বিশ্বাস। এসব কথাই বোঝাতে তিনি বললেন, 'সূর্য থাকে আকাশে, আর জল থাকে নীচুতে। জলকে কি ডেকে বলতে হয় — ওগো সূর্য, তুমি আমাকে উপরে তুলে নাও! সূর্য আপনার স্বভাব থেকে জলকে বাষ্প করে উপরে তুলে নেয়।'

মায়ের এসব কথা যেন মিছরির রুটি। যেদিক থেকেই আস্বাদন করা যাক না কেন, মিষ্টি লাগবেই। ওই যে শরণাগতির কথা, তার রূপটি বোঝাতে মা শোনাতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনের একটি ঘটনা। জ্যৈষ্ঠ মাসের বিকেল। ঝেঁপে বৃষ্টি হয়েছে। ভেসে গেছে মাঠ-ঘাট। আর তাতেই পুকুর ছাপিয়ে উঠেছে মাগুর মাছ। অনেকে লাঠি দিয়ে মারছে সেসব মাছ। ঠাকুর তখন শৌচে যাচ্ছেন। একটি মাছ তাঁর পায়ের কাছে ঘুরঘুর করতে থাকে। তাই দেখে ঠাকুর বলেন, ওরে এটিকে মারিস নে। এটি আমার শরণ নিয়েছে। সেই শরণাগতকে রক্ষা করতে ঠাকুর নিজে সেটিকে ছেড়ে দিয়ে এলেন পুকুরে।

গল্পটির উপসংহারে মায়ের মন্তব্য, 'হে জীব শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।'

এমনি কত না কথা। 'মন না মত্ত হস্তী। ..... হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে।' আবার, 'শেষ মনই গুরু হয়। সাধনা মানে — তাঁর পাদপদ্ম সর্বদা মনে রেখে তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা।' কিংবা, 'ওরা তো কাকের বাচ্চা নয়, কোকিলের বাচ্চা। বড় হলেই আসল মাকে বুঝতে পারে, লালন-পালন করা মাকে ছেড়ে আসল মায়ের কাছে উড়ে যায়।'

এসব কথার মধ্যেই রয়েছে এক আশ্চর্য ব্যঞ্জনা। সহজ রূপ, কথার ভঙ্গিটিও সহজ কিন্তু তারই মধ্যে রয়েছে এক গুরু গম্ভীর ভাবের প্রকাশ। আর তাতেই তাঁর কথা আর কথা নয়, হয়ে উঠেছে বাণী। বুঝি বা বেদ।

বাণীমূর্তি সারদার অসংখ্য কথার মধ্যে দুটি কথা আজও দৈনন্দিন জীবনে দেখায় পথ। জোগায় ভরসা, দেয় আশ্রয়। সেই দুটি কথা — যার একটি হল, আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।' অন্যটি, 'যদি শান্তি চাও কারও দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার'।

এই যে কথা, এই যে ভাব, এই যে

(এরপর ১৩ পাতায়)

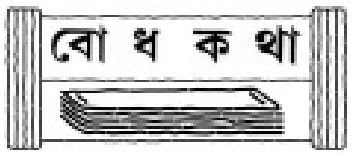

সূর্যের মাহাত্ম্য

সতীনাথ রায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব মহারানী জাম্ববতীর গর্ভজাত। শাম্ব যেমন বলিষ্ঠ শক্তিশালী, তেমন রূপবানও ছিলেন। শাম্ব নিজেও তাঁর রূপ নিয়ে অহঙ্কার করতেন — গর্ব অনুভব করতেন। কিন্তু তাঁর এই অহঙ্কারই একদিন কাল হয়ে দাঁড়াল।

একদিন রুদ্র অবতার দুর্বাসা মুনি বিশেষ প্রয়োজনে দ্বারকাতে আসেন। দুর্বাসার ক্ষীণ শরীর দেখে শাম্ব অট্টহাস্য করতে লাগলেন। নিজের রূপের অহঙ্কারে মত্ত হয়ে তিনি পরোক্ষভাবে মহর্ষির অবমাননা করলেন। দুর্বাসামুনি শাম্ব-র এই আচরণে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন। ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি শাম্বকে অভিশাপ দিলেন। দুর্বাসার অভিশাপে শাম্বর শরীর কুষ্ঠতে ভরে গেল। রূপবান শাম্ব-র সারা শরীরে কুষ্ঠের ক্ষত ফুটে উঠল। সারা শরীরে যন্ত্রণা। অনেক চিকিৎসার পর কুষ্ঠর যন্ত্রণা কিছুটা প্রশমিত হলেও সম্পূর্ণ নিরাময় হল না। শাম্ব তাঁর কুষ্ঠময় শরীর নিয়ে পিতা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন। শ্রীকৃষ্ণ অভিশাপগ্রস্ত পুত্রকে সূর্যনারায়ণের স্তব করার কথা বললেন। সূর্য নারায়ণের বন্দনার কথায় শাম্ব অবাক হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন — আপনি এত দেব-দেবীর পরিবর্তে শুধু সূর্যদেবের বন্দনা করতে বলছেন কেন? পুত্রের কথার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'শাস্ত্রে বহু দেবতার বর্ণনা থাকলেও সূর্যনারায়ণই শ্রেষ্ঠ দেবতা, পুরাণ, ইতিহাসেও তাঁর মাহাত্ম্য-র কথা পাওয়া যায়। সূর্যদেবের কথা বলতে গেলে

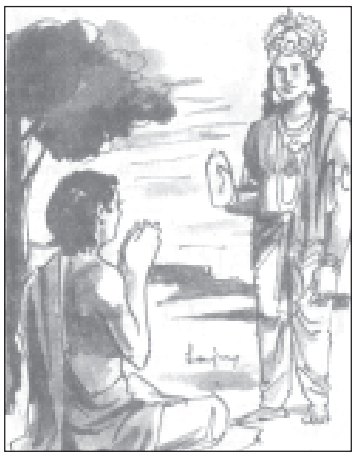

বহু বৎসর অতিবাহিত হয়ে যাবে, তবুও তা শেষ হবে না। তুমি যদি অভিশাপমুক্ত হতে চাও, নিরাময় পেতে চাও, তবে সূর্যনারায়ণের আরাধনা কর।'

শাম্ব পিতার আদেশ মতো সূর্য নারায়ণের কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। শাম্বর শরীর তপস্যার ফলে আরও ভেঙে গেল। অবশেষে সূর্যদেব প্রসন্ন হয়ে শাম্বকে দর্শন দিলেন। প্রসন্ন সূর্যদেব শাম্বকে বললেন, প্রিয় শাম্ব, আমার স্তুতি করার কোনও প্রয়োজন নেই। তোমাকে আমি আমার অত্যন্ত গোপন ও পবিত্র ২১ টি নামের কথা বলছি। তুমি এই নাম জপ করতে থাক। আমার এই নাম ত্রিলোকে প্রসিদ্ধ, এই বলে তিনি ২১টি নামের কথা বললেন —

ওঁ বিকর্তনী বিবস্বাংশ্চ
মার্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমাম্
লোকচক্ষুর্মহেশ্বরঃ।।
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ
কর্তাহর্তা মতিস্ত্রহা।
তপনস্তানশ্চৈব শুচিঃ
সাপ্তাশ্ববাহনঃ।।
গভস্তহস্তো ব্রহ্মা চ
সর্বদেবনমস্কৃতঃ।।

ভগবান সূর্যদেবের এই ২১টি নাম শাম্ব অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে থাকলেন। অবশেষে সূর্যদেব প্রসন্ন হয়ে শাম্বকে আবার দর্শন দিলেন ও তাঁর কষ্ট নিবারণ করলেন। সূর্যদেবের বন্দনায় ও কৃপায় উপকৃত শাম্ব মিত্রবত-এ একটি সূর্য দেবের মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করলেন।

চিত্রকথা ।। ভক্ত ও ভগবান ।। ছাব্বিশ

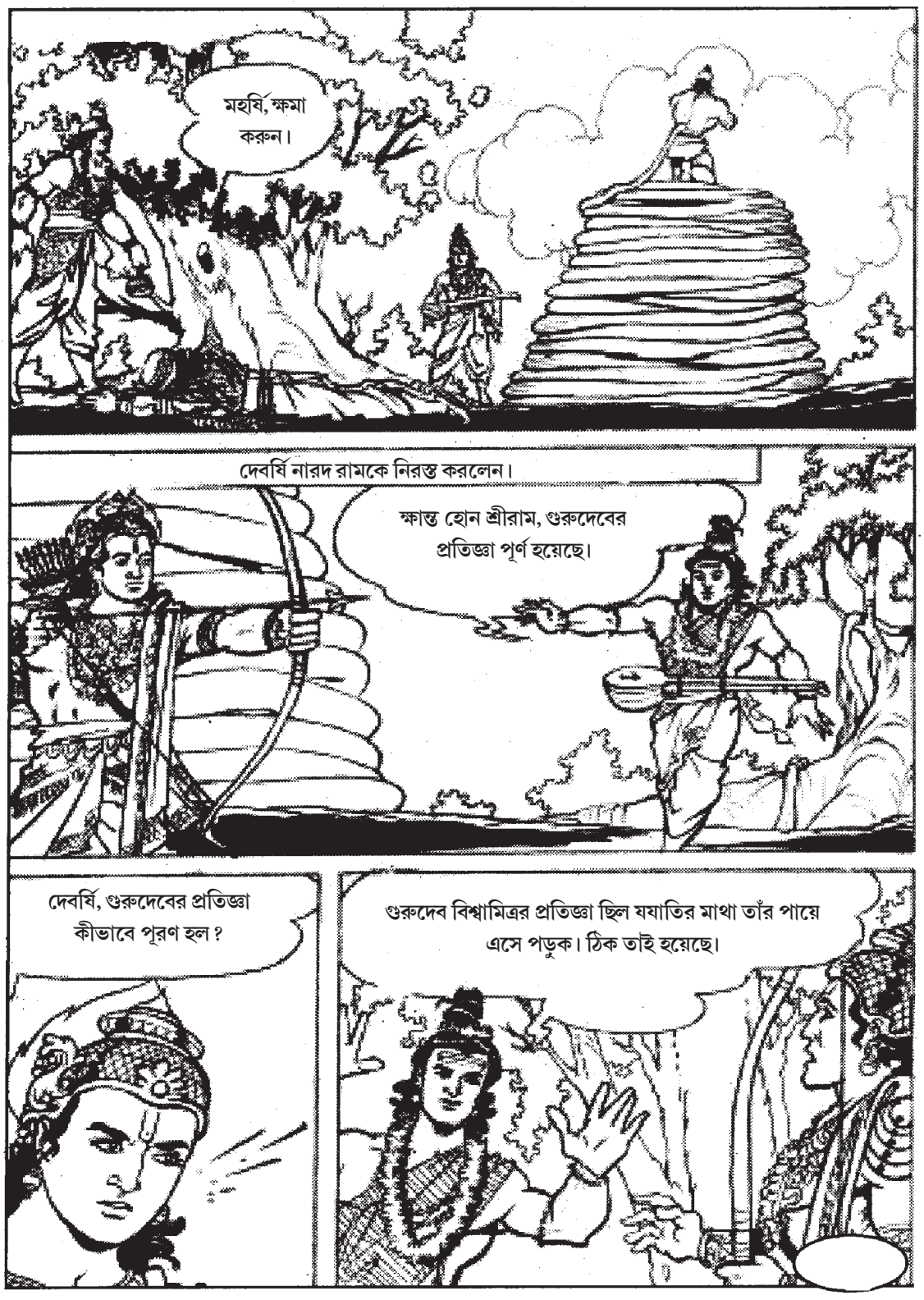

জীবনে বিজ্ঞান

আয়ুবর্ধক রেসিপি

দীর্ঘ, স্বাস্থ্যকর জীবন চান তো রোজ অল্প করে চা কফি পান করুন আর চকোলেট খান। আয়ুবর্ধক ২০টি প্রয়োজনীয় খাদ্যের একটি তালিকা দিয়ে এই উপদেশ দিয়েছেন লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্যারি উইলিয়ামসন। তাঁর দাবি, এগুলিতে উপস্থিত পলিফেনল রাসায়নিক বয়স্ক কোষ চাঙ্গা করে বার্ধক্য প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

ইয়ারফোনে অকাল বধিরতা

কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে নির্বিঘ্নে গান শুনে যাচ্ছেন? এর ফল কিন্তু মারাত্মক হতে পারে। পরিসংখ্যানমাফিক দিনে এক ঘন্টা এভাবে গান শুনলে পাঁচ বছর পর শুনতেই অস্বীকার করবে কানজোড়া। ফল অকাল বধিরতা।

সর্দির ডিপো

টিভি দেখতে রিমোট তো সচল রাখতেই হয়। কিন্তু জানেন কি টিভির রিমোট সর্দির জীবাণুর দারুণ প্রিয়! খুবই পছন্দ আলোর সুইচ। ফ্রিজের হাতল বা টেলিফোনের হ্যান্ডসেট। হাত দিলেই সংক্রমণ হতে পারে। ব্যস, নাক দিয়ে জল। ধরা পড়েছে বৃটিশ বিজ্ঞানীদের গবেষণায়। তাই তাঁরা ওই জিনিসগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

রোবট স্পাইকার

গোটা বিশ্ব এখন সন্ত্রাসবাদীদের কবলে। বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে অহরহ। তাই নিরাপত্তার খাতে এক অভিনব রোবট আবিষ্কার করেছেন অস্ট্রেলিয়ার 'ডিফেন্স সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি-র (ডি এস টি) বিজ্ঞানীরা। তাঁদের তৈরি রোবট 'স্পাইকার' বোমা নিষ্ক্রিয় করতে পারদর্শী। সেক্ষেত্রে কোথাও বোমা থাকার খবরে কাজে লেগে যাবে স্পাইকার। বম্ব-ডিসপোজাল স্কোয়াডের প্রয়োজনই পড়বে না।

উচ্চ রক্তচাপ কমাতে

উচ্চ রক্তচাপ তাড়াবার একটি সুস্বাদু উপায় জানা গেল। পথ্যের নাম চিকেন সুপ। জাপানের 'নিপন মিট প্যাকার্স'-এর কর্ণধার আই সাগা এবং তাঁর সহকর্মীরা পরীক্ষা করে জেনেছেন, মুরগির ঠ্যাঙে মজুত ৪ রকম কোলাজেন প্রোটিন বাড়তি রক্তচাপ কমিয়ে দেওয়ায় দারুণ কার্যকরী।

ধূপ থেকে ক্যান্সার

দীর্ঘদিন নিয়মিত ধূপের ধোঁয়া নাকে গেলে ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ে। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্সার সেন্টার ও ডেনমার্কের স্ট্যাটেন্স সিরাম ইন্সটিটিউট জানিয়েছে, যাঁরা বাড়িতে নিয়মিত ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ধূপ জ্বালিয়েছেন, তাঁদের নাক মুখ ও জিভের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ৪০ শতাংশ বেড়ে যায়।

মাছের তেল

সন্তানকে পড়াশুনোয় তুখোড় করে তুলতে মাছের তেল খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন বৃটেনের ডারহাম কাউন্টি কাউন্সিলের একদল গবেষক। তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের ৬ মাস পরীক্ষা করে তাঁরা জানিয়েছেন, রোজ একটু মাছের তেল খেলে বাড়ন্ত শিশুদের বুদ্ধি বাড়ে।

স্বদেশী মতে, স্বদেশী পথে

(১১ পাতার পর)

রূপ নেয় স্থায়ী গীর্জার।

১৬৮৯ খৃস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর একটি পর্তুগীজ জাহাজ মাকাও থেকে গোয়া যাবার পথে ভারত মহাসাগরে প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ের মুখে পড়ে। বিশাল বিশাল ঢেউয়ের দাপটে জাহাজ রীতিমতো বেসামাল। ডুবে যাওয়ার মুখে। উপায়ান্তর না দেখে নাবিকরা নতজানু হয়ে জাহাজের ডেকে মাতা মেরীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানায়। অঙ্গীকার করে প্রাণরক্ষা হলে মা মেরীর জন্য একটি সেরা গীর্জা বানিয়ে দেবে। প্রবল সেই সামুদ্রিক তুফান শান্ত হয়ে যায় আধ ঘন্টার মধ্যে, আশ্চর্যজনকভাবে। শান্ত হয় প্রকৃতি। জাহাজ তখন ঢেউয়ের ধাক্কায় পৌঁছেছে বঙ্গোপসাগরে বেলাঙ্গনি কূলে। প্রতিজ্ঞানুসারে নাবিকরা বেলাঙ্গানি গীর্জাকে নতুনভাবে নির্মাণ করে দেন সে বছরই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে। বিশ্বের সেরা স্থাপত্য উপাদান দিয়ে।

গীর্জা নির্মাণের পর নাবিকরা ফিরে যায় নিজ দেশে। কিন্তু বেলাঙ্গনির ঘটনা মুছে যায় না তাদের স্মৃতি হতে। প্রতি বছর আসতো তারা আগস্টে। থাকতো সারা সেপ্টেম্বর। সঙ্গে আনতো মাকে উৎসর্গের সেরা দ্রব্য সম্ভার।

পর্তুগীজ নাবিকদের অলৌকিক রক্ষা পাওয়াকে ঘিরে প্রতি বছর ৮ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯ দিন অনুষ্ঠিত হয় বিরাট উৎসব। দেশ-বিদেশ থেকে খৃস্টভক্তদের আগমনে জমজমাট হয়ে ওঠে তামিলনাড়ুর নাগপট্টিনাম জেলার অন্তর্গত সমুদ্র তীরবর্তী বেলাঙ্গনি। চেন্নাই নগরী হতে যার দূরত্ব ৩২০ কিলোমিটার। বেলাঙ্গনি চার্চকে খৃস্টভক্তরা বলেন, "দ্যা সেক্রেড বাসিলিকা" অর্থাৎ পবিত্র প্রাসাদ। মা মেরীর অভিজ্ঞান সেখানে "দ্যা লেডি অফ হেলথ" অর্থাৎ আরোগ্যের দেবী। গীর্জার অন্য পরিচিতি তাঁদের কাছে "আ এবোড অফ মিরাকেলস" অর্থাৎ অলৌকিক অঙ্গন। আসলে ভক্তরা মূলত এখানে আসেন সঙ্কটমুক্তির প্রার্থনা নিয়ে। তাঁদের প্রার্থনা ব্যর্থ যায় না। বহু আর্ত মানুষ এখানে খুঁজে পেয়েছেনতুন করে বাঁচার পথ।

গীর্জার উপাসনা ধারার চমকপ্রদ দিক হল স্বদেশ রীতিতে আরাধনা। দীন দরিদ্রকে দান, মস্তক মুন্ডন, শেষে সমুদ্র স্নান, মাতার উদ্দেশ্যে দন্ডি খাটা, পিতলের থালায় নারকেল, মালা, কর্পূর (আরতির জন্য) ইত্যাদি নৈবেদ্য অর্পণ ইত্যাদি দেখে মনে হয় এখানে গীর্জা সংস্কৃতিতে সত্যই ভারতীয়করণ ঘটেছে। অবশ্য প্রথমদিকে গীর্জা কর্তৃপক্ষ গোয়ার বিশপ ও যাজককুল এই প্রথা প্রতিরোধের চেষ্টা করে। কিন্তু জনআবেগের কাছে তাঁদের বাধার প্রাচীর ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ভারতীয় ধারাই গীর্জার নিজস্ব রীতিতে পরিণত হয়। সে কথা প্রখ্যাত পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদ ফ্রাঁকোয়েস গৌটিয়ার লেখেন একটি নিবন্ধে — Hindu rituals make a Christian Pilgrimage শিরোনামে। সেখানে তিনি বলেছেন — Velangani stands out as a unique place of christian pilgrimage. Nowhere else does one find catholicism with such a Hindu face.

বেলাঙ্গনির এই গীর্জা এখন আর শুধু ভারতীয় খৃস্টান সম্প্রদায়ের কাছেও পরম তীর্থ নয়, বিশ্বের পঞ্চ মহাদেশের কাছে এক অতি পবিত্র স্থান। প্রতি বছর এখানে ১৪ কোটি খৃস্ট ভক্তের আগমন মনে করিয়ে দেয় খৃস্ট দুনিয়ায় আর এক হোলিল্যান্ডের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কথা।

২৬।১১ আক্রমণের পুনরাবৃত্তি রুখতে

সংবাদ মাধ্যম এবং রাজনীতিবিদদের হিন্দু বিরোধিতা বন্ধ করতে হবে

অরিন্দম চৌধুরী

প্রথম ১২ ঘন্টা আমি ঘুমাতে পারিনি। আর আমার সঙ্গী ছিল 'টাইমস্ নাও' (যারা এই মুম্বাই ঘটনার সবথেকে সেরা কভারেজ করেছে এবং তা দেখে আমার মনে বারবার ১৯৯১ সালের ইরাক যুদ্ধ প্রসঙ্গে 'সি এন এন' কভারেজের কথা মনে পড়ছিল)। ঐ ১২ ঘন্টায় দেখলাম, আমাদের গণতন্ত্র নিয়ে কী 'দারুণ' প্রসহন চলছে! এই মহান দেশের দায়িত্ববোধহীন এবং মেরুদণ্ডহীন রাজনৈতিক মহলের দোষে দেশের সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আমাদের বীর পুলিশকর্মীদের জীবন উৎসর্গ হতে দেখে আমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল! যখন আমাদের কোনও রাজনীতিবিদ মুখ খুলছিলেন, তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে ভেতরে ভেতরে আমার সত্যিই লজ্জা লাগছিল! তখন বারবার মনে প্রশ্ন জাগছিল, কবে এই বস্তাপচা, ভগ্ন এবং 'মৃতপ্রায়' রাজনীতিবিদদের (যাঁরা কয়েক হাজার কোটি টাকার লোভে দেশটাকে কিছু শয়তানের হাতে তুলে দিতেও দ্বিধা বোধ করেন না।) হাত থেকে মুক্তি পাব আমরা? আমাদের দেশের দায়িত্ববোধহীন এবং দূরদৃষ্টিবর্জিত কিছু 'নেতা'র ভুলের খেসারত দিতে গিয়ে দেশকে এভাবে ভুগতে দেখাটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক! 'আমরা অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করছি' কিংবা 'গোয়েন্দা বিভাগের বাজেট বাড়ানোর চেষ্টা করছি'—এরকম ফাঁপা বুলি আগে কতবার শুনতে হয়েছে বলুন তো? একের পর এক জঘন্য আক্রমণের হাত থেকে দেশবাসীকে বাঁচাতে প্রতিবার ব্যর্থ হওয়ার পরও নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীপদ থেকে তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করার কথা তো ভুলে যান, আমাদের রীজনীতিবিদরা এতটাই অশিক্ষিত এবং নির্লজ্জ যে, সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ঐসব বস্তাপচা ফাঁপা বুলি আওড়াতে তাঁদের আজকাল এতটুকু লজ্জা লাগে না! তাই যখন এই ২৬।১১ আক্রমণের আসল কারণ খুঁজতে শুরু করি, তখন আমাদের সরকারের হিন্দু-বিরোধী মানসিকতাকে দোষারোপ না করে থাকতে পারলাম না। এটা তো নতুন কিছু নয়, আজ বেশ কয়েক বছর ধরে তারা এটাই চালিয়ে যাচ্ছে। আসলে গত এক পক্ষ ধরে একের পর এক সংবাদপত্র যেভাবে 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদী' এবং 'হিন্দু বোমা' নিয়ে মাতামাতি শুরু করেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা ভাবতে আমি বাধ্য হচ্ছি। আমার জীবনে তো আমি কোনও সংবাদমাধ্যমকে কোনও ব্যক্তিকে 'মুসলিম সন্ত্রাসবাদী' কিংবা কোনও বোমাকে 'মুসলিম বোমা' বলতে শুনিনি। আর সেটাই তো যুক্তিযুক্ত! কিন্তু এই সাম্প্রতিক সত্য বা মিথ্যার (হ্যাঁ, আমার মতে, আইনের চোখে হিন্দু বা মুসলিম সব অপরাধীই সমান) ভিত্তিতে কোনও বিশেষ ধরনের সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের পেছনে যেভাবে হিন্দুদের দায়ী বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুত্ববাদকে (এবং নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে অবশ্যই বিজেপি-কে) কালিমালিপ্ত করার জন্য 'হিন্দু বোমা'র মতো শব্দের জন্ম দেওয়ার স্বাধীনতা পেয়ে গেছে আমাদের রাজনীতিবিদরা! ভারতের বুকে এটা খুব সহজেই করা যায়। কারণ, হিন্দুই হল এমন এক ধর্ম, যে ধর্ম ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও এদেশের বুকে বারবার লাঞ্ছিত হয়েছে এবং লাঞ্ছনাকারীরা কিন্তু প্রতিবারই পার পেয়ে গেছে। কারণ, হিন্দুরা আসলে কিন্তু 'সন্ত্রাসবাদী' বা 'বোমাবাজ' নয়;লোকে তাদের সহনশীল, ধৈর্যশীল, এমনকী (গান্ধীজির কথায় ভরসা রেখে বলছি) 'কাপুরুষ' বলেও মনে করে। তাই তো নির্বাচনের সময় মুসলিম

> **যে কোনও সম্প্রদায়ের অপরাধগুলোকে তোষামোদ করা এবং অহেতুক সহ্য করার ফলে সেই সম্প্রদায় একদিন জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে ছেলেখেলা শুরু করে। আর সেজন্যই আজকের ভারত বারবার ২৬।১১ আক্রমণের মতো দুর্দশার শিকার হচ্ছে।**

ভোট ব্যাঙ্কের মন জয় করার বাসনায় বলতে গেলে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই হিন্দুদের উপর অপব্যবহার করছে আজকাল। শুধু কি তারা? তদন্ত বিভাগগুলোও ইচ্ছেমতো হিন্দু মহিলাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। কারণ, সবাই জানে যে, তাদের দুর্দশা দেখেও কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাদের মানবাধিকার নিয়ে "আহা-উহু আন্দোলন' শুরু করবে না!

শুধু তাই নয়। এই ষড়যন্ত্র রাজনৈতিক মহলের সুরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাগ্রহে (কখনও-সখনও বাধ্য হয়ে) সুর মেলাতে আদৌ দ্বিধা বোধ করে না ভারতের অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম এবং তাদের সাথে জড়িত কিছু ভুয়ো ও অর্ধশিক্ষিত সাংবাদিকের দল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্ধের মতো মুসলিমদের (এমনকি হাতেনাতে ধরা পড়া সন্ত্রাসবাদীদের) এবং তাদের মৌলবাদেরও তোষামোদ করে ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকরা, আর হিন্দু-বিরোধিতার মাধ্যমে নিজেদের নামের পাশে ফাঁপা 'ধর্মনিরপেক্ষ' তক্‌মা বসাতে চায়। কিছু কিছু সংবাদমাধ্যম তো এ ধরনের মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন করাকে নিজেদের মূলমন্ত্র বানিয়ে ফেলেছে; কারণ, তা করলে বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা তাদের হাতে কাঁড়ি কাঁড়ি আর্থিক অনুদান তুলে দেয়, প্রশংসা করে এবং কিছু 'তথাকথিত' চিন্তাশীল আলোচনাসভা বা পুরস্কার বিতরণী সভার আয়োজন করে সেখানে তাদের নানা ধরনের পুরস্কারে ভূষিত করে! হ্যাঁ, যেসব সংবাদমাধ্যম সরকার চালিত প্রচারের ঢোল পেটাতে অস্বীকার করে, তাদের উপর সরকার আয়কর, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ এবং এম আর টি পি মামলার মতো হাজারটা বোঝা চাপিয়ে দেয় (যাতে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' রব ছাড়তে ছাড়তে তারা সরকারের বশ্যতা স্বীকার করে)।

মনে রাখা উচিত, যে কোনও সম্প্রদায়ের অপরাধগুলোকে তোষামোদ করা এবং অহেতুক সহ্য করার ফলে সেই সম্প্রদায় একদিন জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে ছেলেখেলা শুরু করে। আর সেজন্যই আজকের ভারত বারবার ২৬।১১ আক্রমণের মতো দুর্দশার শিকার হচ্ছে। ঠিক এই কারণেই ভারতের কোনও সরকার যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। কারণ, তারা সব সময় একটা আশঙ্কাতেই ভুগতে থাকে যে, কোনও মুসলিম বোমাবাজকে ফাঁসি দেওয়া হলে, মুসলিম সন্ত্রাসবাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কিংবা মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকার উপর তল্লাশি চালানো হলে, তারা নিজস্ব মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক হারাতে পারে। পাশাপাশি 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র অশিক্ষিত সংজ্ঞানুসারে তারা হয়ত নিজেদের 'সতত ধর্মনিরপেক্ষ' খেতাবটাও হারাতে পারে! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের মধ্যে এটাই তো সবথেকে বড় পার্থক্য। বাস্তব সত্যকে কীভাবে কেতাবি চিন্তাবিদ স্লোগান থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়, সেটা আমেরিকানরা বেশ ভালোভাবেই জানে। মুসলিম দুনিয়ার বিরুদ্ধে তাদের বিশেষ কোনও রাগ নেই (আমাদেরও তো সেরকম কোনও রাগ নেই এবং রাগ থাকাটা উচিতও নয়), তবে তারা ঠিক করেছে যে, আল্-কায়দার মতো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী এবং তাদের মৌলবাদী সন্ত্রাসকে তারা কখনই মুখ বন্ধ করে সহ্য করবে না। আর একবার সেরকম কোনও সিদ্ধান্ত গৃহিত হলে সর্বশক্তি নিয়ে সেইসব সংস্থা বা গোষ্ঠীর শিকড় উপড়ে ফেলার সাহসও আছে তাদের। কোনও

> **'গণতন্ত্র' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষতার' মানে কিন্তু আইনশৃঙ্খলা এবং জাতীয় নিরাপত্তার সাথে আপস করা নয়! কোনও দেশই তা করে না এবং অনতিবিলম্বে আমাদেরও তা বন্ধ করতে হবে।**

শক্তিশালী দেশ এবং দুর্বল দেশের (সুবিধাবাদী নেতাদের হাতে পড়ে যা মেরুদণ্ডহীন হয়ে যায়) মধ্যে এটাই একটা বড় পার্থক্য। শক্তিশালী যে কোনও দেশ শক্তিশালী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়িত করে। কোনও দুর্বল মেরুদণ্ডহীন দেশই তো বারংবার 'আমরা কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে' বলে সময় নষ্ট করতে থাকে। আশ্বাস দিলেও তারা তো কাজের নামে অষ্টরম্ভা। তারপর জন্ম নেয় 'হিন্দু বোমা'র মতো বড়সড় প্রহসন, এবং পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ তক্‌মার লোভে তাদের সমর্থন করতে শুরু করে ওইসব আক্রমণকে। তখন তারা বলতে শুরু করে যে, হিন্দুরাও ঐ একই ধরনের সন্ত্রাসবাদী....;এর থেকে বড় লজ্জার বিষয় আর কিছু হতে পারে না!

যখন কোনও দেশের কেউই বাইরে বেরিয়ে এসে সবার সামনে আসল সমস্যাদির কথা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করার মতো সাহস দেখাতে পারে না, তখন সে দেশের অবস্থা কেমন হতে পারে, সেটা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন। অধিকাংশ 'ভারতীয় মুসলিমরা' নিশ্চয়ই মানবেন যে, ভারত-বিরোধী চিন্তা পোষণকারী প্রত্যেক অ-ভারতীয় এবং সন্ত্রাসবাদীকে (তা সে হিন্দু হোক বা মুসলিম) কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে এবং সমস্ত গোপন আস্তানা থেকে টেনে বার করে জেলে ভরতে হবে। তাঁরা নিশ্চয়ই মানবেন যে, "গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মানে কিন্তু আইনশৃঙ্খলা এবং জাতীয় নিরাপত্তার সাথে আপস করা নয়'! কোনও দেশই তা করে না এবং অনতিবিলম্বে আমাদেরও তা বন্ধ করতে হবে। 'দ্য সান্‌ডে ইন্ডিয়ান' চিরকালই যুক্তি এবং নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেয়। ইরাক প্রসঙ্গে বুশ ভুল করেছিলেন বলে, আমরা আমাদের প্রতিটি পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর সমালোচনা করেছি, কাশ্মীরের 'আজাদীর' ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা আছে বলে, সে প্রসঙ্গেও আমরা 'মূলকথা' ছেপেছি....! তাই আজ আমরা বলছি যে, কোনও হিন্দু সন্ত্রাসবাদী দ্বারা ব্যবহৃত বোমার গায়ে 'হিন্দু বোমা' তক্‌মা লাগিয়ে গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাকে কখনও রক্ষা করা যায় না! দেশের জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে যারা প্রতিনিয়ত ছেলেখেলা করছে, কঠোর হাতে (এবং ধর্মের বাছবিচার না করে) তাদের চিহ্নিত করা এবং শাস্তি দেওয়াটাও গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার দায়িত্ব! একমাত্র তখনই আসবে শান্তি। একমাত্র তখনই আমরা সমস্ত ধর্মের মানুষকে ভালোবাসতে পারব। একমাত্র তখনই আব্দুল কালাম এবং আমেরিকার বারাক 'হুসেন' ওবামার মতো কোনও মুসলিমকে আমরা সগর্বে দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে দেখতে পাব! তখন কিন্তু কেউ তাঁর ধর্ম নিয়ে মাথাও ঘামাবে না! কারণ, সমস্ত সংকীর্ণতা ভুলে আমাদের 'ভারতবাসী' হতে হবে, এবং 'ভারতবাসী' পরিচিতিটার সম্মান রক্ষা করতে হবে! ২৬।১১ আক্রমণ যদি আমাদের সবার মনে সেই ভারতীয় সত্ত্বার তাগিদটা জাগাতে না পারে,তাহলে সে তাগিদ আর কখনও জাগবে বলে তো আমার মনে হয় না!

[লেখক 'দ্য সান্‌ডে ইন্ডিয়ান'-এর সম্পাদক। 'দ্য সান্‌ডে ইন্ডিয়ান'-এর সৌজন্যে]

শ্রীসারদা কথামৃত

(১১ পাতার পর)

উপলব্ধি — যদি মনপ্রাণ দিয়ে মেনে চলা যায় এই কথা, তাহলে আজকের দুনিয়ায় যাপন করা যায় এক উদ্বেগহীন, টেনসন-মুক্তজীবন।

সত্যি কথা বলতে কি, এসব কথা দিয়ে মা সারদা সন্তানদের ডেকে নিয়েছেন রামকৃষ্ণ মহাসাগরের দিকেই। তাদের অমৃতপানের পিপাসাকে করেছেন সুতীব্র। আরও সহজ করে বলতে গেলে, রামকৃষ্ণ তাঁর স্বল্পকালীন নশ্বর জীবনে যে অমৃতবাণীর মহাতরুটি বপন করেছিলেন, দীর্ঘদিন দেহে থেকে মা সারদা তাকে লালন করেছেন, পরিবর্ধিত করেছেন। রামকৃষ্ণের শক্তিস্বরূপিণী মা সারদা ঠিক ওই কারণেই সঙ্ঘ জীবনের কেন্দ্রে রয়েছেন। সেদিন এবং আজও মা সারদার কথামৃত শুধু রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ মিশন বা তাঁর সন্তানদের নয়, তাবৎ বিশ্বের মানুষকে দিচ্ছে সত্য, সুন্দর ও শিবের সন্ধান।

মাতৃরূপে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের তাই তিনি প্রাণের দেবতা। শুধু 'মা' বলে ডেকে একটি প্রণাম নিবেদনের মধ্যেই মেলে তাঁর করুণা। তাই বা কেন, তাঁকে ডেকে বা না ডেকে, শুধুই তাঁর কথা স্মরণ করেও মানুষ পায় তাঁর স্নেহ। পাবেই তো, তিনি যে মা — বিশ্বজননী।

মারাদোনায় মাতোয়ারা কলকাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা। নামটি শুনলেই দেহ-মনে অন্যরকম শিহরণ খেলে যায় বিশ্বের প্রতিটি মানুষের। বলকে নিয়ে যা খুশি করতে পারেন। পারলে যেন বলকে কথা বলিয়ে ছাড়েন। অসাধারণ, অবিশ্বাস্য সব কান্ড-কারখানা দেখলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক মারাদোনা কী মানুষ না দেবদূত? ৮৬-তে তার অতিমানবিক স্কিল ও টেকনিক এখনো টাটকা স্মৃতি হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। প্রায় একার কৃতিত্বে সে বছর আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জিতিয়ে দিয়েছিলেন। তার পরের বারও দলকে ফাইনালে তুলেছিলেন। তবে জার্মানির সঙ্গে শেষ লড়াইটি জিততে পারেননি। ৯৪-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপে ডোপ কেলেঙ্কারির দায়ে টুর্ণামেন্টের মাঝপর্বে নির্বাসিত হন ফিফার নির্দেশে। চারটি বিশ্বকাপ খেলেছেন, ইতালিতে, স্পেনে ক্লাব ফুটবল খেলেছেন। মাঠ ও মাঠের বাইরে এক বর্ণময় চরিত্র মারাদোনা।

এহেন মারাদোনা কলকাতায় এলেন, দেখলেন, জয় করলেন বাঙালির হৃদয়।

এটাই তো প্রত্যাশিত ছিল। বাঙালির যে হৃদয়ের ধন, নয়নের মণি মারাদোনা। কিউবার অবিসম্বাদী নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর বন্ধু, লাতিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রামের নায়ক চে গুয়েভারার ভক্ত মারাদোনা বরাবরই সমাজবাদী ভাবধারা ও দর্শনের আঁধারে নিজেকে প্রতিবিম্বিত করতে ভালবাসেন। তাই কলকাতার দুই সিপিএম নেতা ও এক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কর্তা তাঁকে কলকাতায় আসার প্রস্তাব দিলে এক কথায় রাজি হয়ে যান।

মহেশতলায় ফুটবল অ্যাকাদেমি উদ্বোধন, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সম্বর্ধনা, মোহনবাগান মাঠে ক্ষুদে ফুটবলারদের ক্লিনিক দেখে দুদিনের ব্যস্ত সফরসূচী অতিবাহিত করলেন মারাদোনা। এখানে সঙ্গত প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, প্রায় দশ কোটি টাকা খরচ করে মারাদোনার এই সফর কতখানি প্রাসঙ্গিক বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে? টপ ফর্মে খেলোয়াড় মারাদোনাকে নিয়ে এসে ম্যাচ খেললে তাও সামান্য হলে লাভ হত তরুণ ফুটবলারদের। শুধুমাত্র মাঠ ঘুরিয়ে, সম্বর্ধনা দিয়ে বাংলার ফুটবলের কোন উদ্দেশ্য পূরণ হবে?

যে রাজ্যে সরকার ফুটবল পরিকাঠামো গড়তে ব্যর্থ, যুবভারতীয় মাঠ ও স্টেডিয়াম রক্ষণাবেক্ষণ করতে ব্যর্থ সেখানে এত টাকা খরচ করার সার্থকতা কোথায়? আসলে এ রাজ্যে ক্রীড়ামন্ত্রী তো সবদিক থেকেই ব্যর্থ। তাকে দিয়ে কোনও দিনও কোনও সদর্থক, গঠনমূলক কাজ হয়নি, হবেও না। তাঁর দ্বারা মারাদোনাকে আনাও সম্ভব হত না। যদিও তিনি দশ বছর ধরে শুনিয়ে যাচ্ছেন মারাদোনাকে আনবেন। বিদেশ থেকে ভাল-ভাল ক্লাবদল এনে এখানে বড় ক্লাব বা ভারতীয় দলের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলাবেন। এর একটাও করে উঠতেপারেননি। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বা ভাঁওতা দেওয়া ছাড়া তার আর কোনও বৈশিষ্ট নেই। তবু রক্ষে, তাঁর দলের এক সাংসদ মারাদোনার মতো বিশ্ব ব্যক্তিত্বকে চাক্ষুস দেখার সুযোগ করে দিয়েছে বাঙালিকে।

খেলার জগৎ

তাই সমীক লাহিড়ি ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা সেলিব্রিটি ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের কর্ণধার ভাস্কর গোস্বামীকে অবশ্যই ধন্যবাদ — মারাদোনাকে অন্তত এক বারের জন্য কলকাতায় নিয়ে আসার জন্য। তার আগমনে কতখানি উপকার হবে বাংলার ফুটবলের সে প্রশ্ন দূরে সরিয়ে রেখে অন্তত এটুকু বলা যায় মারাদোনাকে দেখে যে উদ্দীপনা ও আবেগের সঞ্চার হয়েছে কলকাতা ফুটবল সমাজে, সে ব্যাপারটাই টনিকের কাজ করবে ঘরোয়া ফুটবলকে অক্সিজেন জোগাতে। আর বাইচুঙের চাপে ম্যাচের উদ্যোক্তারা ম্যাচ থেকে প্রাপ্ত অর্থের কিয়দংশ প্রাক্তন দুঃস্থ অলিম্পিয়ানদের দিয়েছে ও বহু তরুণ ফুটবলার একটা ম্যাচ খেলেই ২০/২৫ হাজার টাকা পেয়েছে সেটাই বা কম কিসের? মারাদোনাই পারেন মানুষকে দিয়ে মহৎ কাজ করিয়ে নিতে।

তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মহিলা বক্সার

মেরিকমকে চেনেনই না মিলখা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। একজন ভারতবর্ষের সর্বকালের সেরা অ্যাথলিট বা অন্যতম সেরা ক্রীড়াবিদ্‌ও বটে। অন্যজন তিন-তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মহিলা বক্সার। মাত্র ক'দিন আগেই বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ৪৮ কিলো বিভাগে সোনা জিতে নিজের ও দেশের গৌরব ধরে রেখেছেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি মিলখা সিংহ। যাকে দেশের মানুষ একডাকে চেনে, নাম শুনলে সম্ভ্রমে মাথা নোয়ায়। তিনি দুনিয়ার সব খেলার খবর রাখেন। অত্যন্ত সমাজ সচেতন সজ্জন ব্যক্তিত্ব। অথচ তিনি কিনা মেরিকমের নামই শোনেননি। মণিপুরী মেয়েটি ভারতীয় বক্সিংয়ে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছেন।

ইতিমধ্যেই তাকে অ্যামেচার বক্সিংয়ে 'মেয়েদের রকি মাসিয়ানো' বলা হচ্ছে। সেই পঞ্চাশ-ষাটের দশকে ইতালিয়ান-মার্কিন শ্বেতাঙ্গ ফাইটার রকি মাসিয়ানো যিনি হেভিওয়েট পরবর্তীতে সুপার হেভিওয়েট বক্সিংয়ে রিংয়ে নেমে কোনও লড়াই হারেননি। যাকে নিয়ে জীবিত কালেই হলিউডে ব্লক বাস্টার ছবি হয়েছে। 'রকি ওয়ান, টু, থ্রি'— তিন পর্বের ছবিতে অভিনয় করেছেন কিংবদন্তী অভিনেতা তথা বক্সার স্ট্যালোর্ন। যদিও মেরিকম লাইট ওয়েট বক্সার, কিন্তু তার উদগ্র লড়াকু মনোবৃত্তি ও প্রতিটি লড়াই জেতার অদম্য স্পিরিট দেখে তাকে বিশ্ববক্সিং মিডিয়া রকি মাসিয়ানোর সঙ্গে তুলনা করেন।

মণিপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে এসে যাবতীয় সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে বিশ্ব মঞ্চে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন মেরিকম। যা দেখে অনুপ্রাণিত হতে পারে দেশের সব ক্ষেত্রের সব পেশার মহিলারা। মণিপুর সরকার তাকে রাজ্যরত্ন ঘোষণা করেছেন। বাড়ি করে দিয়েছেন, কর্মক্ষেত্রে ক্লাস ওয়ান সরকারি অফিসার তিনি। মণিপুর সরকার ও সেখানকার সাধারণ মানুষ বরাবরই ক্রীড়াসংস্কৃতি মনস্ক। তাইতো ঝাঁকে ঝাঁকে মণিপুরী ফুটবলার দাপিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে ভারতবর্ষের বিভিন্নক্লাবে অ্যাথলেটিক্স, বক্সিং, ওয়েটলিফটিং, জিমনাস্টিকের মতো ইভেন্টেও মণিপুরী ছেলে-মেয়েদের সর্বভারতীয় প্রাধান্য রয়েছে। জাতীয় গেমসে মণিপুর প্রথম পাঁচ-এ থাকে। কিন্তু গোটা দেশে মেরিকমদের স্বীকৃতি, সমাদর কতটুকু?

এই যে মেরিকম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরলেন, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বা ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা কোনও সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেনি। মাত্র একমাসের ব্যবধানে

মেরিকম

ভারতবর্ষ দু'জন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান পেল। বিশ্ব দাবার খেতাবী লড়াই জিতে গোটা পৃথিবীতে সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম দখল করেছেন বিশ্বনাথন আনন্দ। ভারতেও পত্র-পত্রিকা, টি ভি চ্যানেলে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছেন আনন্দ। তা হওয়াই প্রত্যাশিত, দেশের সর্বকালের সেরা ক্রীড়া শিল্পী বলে কথা। কিন্তু মেরিকমের কৃতিত্বই বা কম কি?

দেশের কটা লোক জানে তার নাম, কীর্তিকলাপ। তাই মিলখা সিংহকে দোষও দেওয়া যায় না। তার ছেলে বিশ্ব গলফে বড় মাপের কোনও সাফল্য পেলে মোটামুটি খবরের কাগজে বা চ্যানেলে প্রত্যাশিত মাইলেজ পান। কিন্তু মণিপুর তনয়ার ভাগ্যে সেটুকু জোটে না। সারা বছর মিডিয়ার সিংহভাগ জুড়ে থাকে ক্রিকেট। গলফ, শুটিং, দাবা, বক্সিংয়ে যে ভারত আন্তর্জাতিক শক্তি হয়ে উঠেছে এ ব্যাপারটা জেনেও চোখ বুজে রয়েছে মিডিয়া।

তবুও আনন্দ, জীব মিলখা, অভিনব বিন্দ্রা বা হালের দুই বক্সার অখিল কুমার, বিজেন্দার কুমার বেজিং অলিম্পিকে সোরগোল ফেলে দেওয়ায় দেশের মিডিয়া ও সাধারণ মানুষ নড়েচড়ে বসেছে। কদিন তাদের নিয়ে চর্চাও হয়েছে। কিন্তু মেরিকমের ইভেন্টটি অবহেলিতই থেকে গেল। যদি মেয়েদের বক্সিং বিশ্ব অলিম্পিক সংসারে অন্তর্ভুক্ত হত তাহলে হয়ত তাকে খানিকটা জায়গা দিত সংবাদ মাধ্যম।

কল্যাণ আশ্রমের ১৫তম প্রাদেশিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সংবাদদাতা ।। গত ৬-৭ ডিসেম্বর পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম (দক্ষিণবঙ্গ)-এর পরিচালনায় ১৫ তম প্রাদেশিক একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পশ্চিম পুরুলিয়া জেলার বাগমুন্ডি ছাতাটাঁড় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পান্ডব কুমার, প্রধান অতিথি বিদ্যালয় পরিদর্শক যদুনাথ সরেন। হার্ডলস-এর জাতীয় চ্যাম্পিয়ন তথা কলকাতা ইউনিভার্সিটি ব্লু জীবেন রায় বিশেষ অতিথি আর অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের ব্যবস্থাপক তথা পূর্বক্ষেত্র সংগঠন সম্পাদকপ্রমুখ গজানন বাপট প্রধান বক্তা। অনুষ্ঠানের শুরুতে ১০টি জেলা থেকে আগত প্রতিযোগীরা মার্চ পাস্ট-এর মাধ্যমে মঞ্চ স্থ সকলকে অভিবাদন জানান, শপথ বাক্য পাঠ করান অশোক মুর্মু। বিমলা হাঁসদা ছত্র.উ.ঢ সল্ট লেক প্রশিক্ষার্থী, বর্তমানে বেঙ্গালুরুতে প্রশিক্ষণরত) কর্তৃক আধুনিক ধনুক ও তীর প্রদর্শিত হয়।

এবার খেলায় এ্যাথলেটিক্স, কবাডি, দীর্ঘলম্ফন ও তীরন্দাজী অনুষ্ঠিত হয়। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের মেডেল, পুরস্কার ও শংসাপত্র দেওয়া হয়। এই প্রাদেশিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে ১০টি জেলা থেকে ১৮৭ পুরুষ এবং ১০২ মহিলাসহ মোট ২৮৯ জন অংশগ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ থাকে যে, অক্টোবর ও নভেম্বর দু'মাস ধরে ১০টি জেলার ৩৫টি ব্লকে খেলা হয়, সেখানে মোট ১৮৩৮ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন। তারাই নির্বাচিত হয়ে প্রাদেশিক খেলায় অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ আশ্রমের প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক চক্রধর সরেন, সহ-প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক মহাদেব গড়াই, ক্ষেত্রীয় ক্রীড়া প্রমুখ প্রবোধ কুমার নন্দ, ক্ষেত্রীয় ছাত্রাবাস প্রমুখ মহীতোষ গোল, প্রান্ত ক্রীড়াপ্রমুখ বিষ্ণুচরণ মাহাত। সুরথ মাছুয়ার (অঞ্চল প্রধান, বাগমুন্ডি), চিত্ত রঞ্জন মাহাত (সুইসা স্কুলের প্রধান শিক্ষক), নিবারণ মাহাত (প্রধান শিক্ষক-বাগমুন্ডি স্কুল এবং প্রান্ত ক্রীড়া পরিচালনা সমিতির আহ্বায়ক) কল্যাণ আশ্রমের পশ্চিম পুরুলিয়া জেলার সভাপতি নাগরঞ্জন গাঙ্গুলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিচারক ধীরেন্দ্রনাথ সিং মাহাত এবং ঘোষক ছিলেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়।

খেলার সমাপ্তি হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে।

তাজ-কাণ্ড প্রতিবেশীর মুশকিলের পরিহাস

বিশাখা বিশ্বাস

কাঞ্চীপীঠের আচার্য শঙ্করাচার্যের গ্রেফতার এবং পরে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে আদালতে চার্জশীট দাখিলের আগেই সেই মামলা প্রত্যাহার করে নিয়ে নিস্তার পেলো সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির পুলিশ-প্রশাসন। তথাকথিত সেকুলার সরকারগুলির চাপ, ভারতের খৃস্টান লবির মদৎ এবং পেট্রোডলারের সরবরাহ পেয়ে ভারতের বৃহৎ পুঁজির সংবাদপত্র ও মিডিয়াগুলি কীভাবে কাঞ্চীর শংকরাচার্যের গ্রেফতারের খবর আবিশ্ব এই পৃথিবীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল অথচ সেই মামলারই প্রত্যাহারের খবরটিকে নীরবে কেমন করে খুন করেছিল—পাঠকেরা স্বস্তিকায় তার কিছু নমুনা পেয়েছেন (তাং-১৭-১১-০৮)। এই ভাবেই বৃহৎ পুঁজি পরিচালিত বাজারের বারোয়ারি সেকুলার সংবাদপত্র এবং মিডিয়াগুলি জনগণকে জানতেই দেয় না যে, সান্তা বারবারাতে সেন্ট এ্যান্টনীসের চৌত্রিশ জন বালক-বালিকার ওপর দীর্ঘ এগারো বছর ধরে যৌন অত্যাচারের দায়ে এবং লং-বীচের পাদ্রীরা ধর্ষণের অভিযোগে কেউ আদালতে জরিমানা দিয়ে, কেউ আত্মহত্যা করে নিস্তার লাভ করেন। পাঠকেরা সেসব খবর পান না। কেননা বিশ্ব খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদের দেশী চর-অনুচরেরা সংবাদপত্রগুলির ভেতরে থেকে সেইসব খবরকে বিশ্বালোক দেখার অনুমতিই দেয় না। ভারতীয় সাংবাদিকতায় এই ধারা নতুন সংযোজন নয়। শহীদ ভগৎ সিংয়ের ফাঁসীর আদেশ বাতিলের প্রশ্নে গান্ধীজী বিষয়টিকে 'জঘন্য' বলে প্রত্যাখ্যান করলে যেসব সংবাদ মিডিয়া সেই সব খবরকে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেছিল, আচার্য শ্রদ্ধানন্দ হত্যার মুসলিম ঘাতকের ফাঁসীর আদেশ মকুবের জন্যে সেই বাপুজীর তদ্বিরের প্রশ্নটিকেই সেইসব সংবাদপত্রগুলিই কিন্তু ঠান্ডা মাথায় গুম করে রেখেছিল। কেননা, বিধর্মী বিদেশী মুসলিম ও খৃস্টান

ভারতের বৃহৎ পুঁজির সংবাদপত্র ও মিডিয়াগুলি কীভাবে কাঞ্চীর শংকরাচার্যের গ্রেফতারের খবর আবিশ্ব এই পৃথিবীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল অথচ সেই মামলারই প্রত্যাহারের খবরটিকে নীরবে কেমন করে খুন করেছিল—পাঠকেরা স্বস্তিকায় তার কিছু নমুনা পেয়েছেন।

সাম্রাজ্যবাদের ছদ্মবেশী স্বদেশী সেবাদাসেরা সেই সব সংবাদপত্রগুলিকে প্রভাবিত করে রাখতো।

আপন আত্মজাকে স্বহস্তে খুন করার খবর এবং খুনী পিতা-হিন্দুত্ববাদী রাজেশ তালোয়ারের গ্রেফতারের খবর যে সব নিউজ এজেন্সীগুলি বিশ্বের পাঠকসমাজে নানা গল্পে নানা রংগালাপে পৌঁছে দিয়েছিল, আদালতে কানমলা খাওয়ার আগে সেই আদালত থেকে পুলিশের সেই মামলা প্রত্যাহারের খবরও সেইসব ডলার-সাম্রাজ্যবাদ ও শাসকশ্রেণীর অনুগৃহীত সংবাদ মিডিয়াগুলিই কিন্তু পাঠকের কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছিল (স্বস্তিকার খবর-তাং ১৭।১১।০৮)। এই সব সংবাদপত্র এবং মিডিয়াগুলিও এ দেশের সেকুলার সরকারগুলির মতো ''বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়গুলিকে বিশেষ বিশেষ কন্‌সেশন দান করে 'করে কম্মে খায়' — তাই, এরাই আবার আমাদের সেই সব খবর দেয় না, যে খবরে প্রকাশ পায়, এগারো বারো বছরের বালিকাগণের ওপর বলাৎকার করার অভিযোগে লস্‌-এঞ্জেলস—এর আদালত কয়েকজন ফাদার-মাদারের সাথে খোদ ফাদার রুডিকে এবং ক্যাথলিক চার্চকে চারশ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করেছে। আমাদের সংবাদ-মিডিয়াগুলি আমাদের এই সব খবর জানায় না (তাদের দোষ নেই) কেননা, বিদেশী বিধর্মী মনিবের ডলার এবং দেশী শাসকের হাতে ধরা তাদের গলবন্ধ থেকে তারা সেই অনুমতি পায় না।...

অস্ত্রের দ্বারা দেশ জয় এবং বিজিত দেশে গেঁড়ে বসে শাসন ও শোষণের দিন অপগত হয়ে গেছে। কিন্তু ধর্মীয় সংখ্যালঘু সাম্রাজ্যবাদ আজ এ দেশে শক্তিশালী রয়েছে। সংখ্যালঘু সেই খৃস্টান ও ইসলামের আন্তর্জাতিক চক্রান্তের এবারের লক্ষ্য ভারতবর্ষ। সেই লক্ষ্যে একদিকে এ দেশে চলেছে নীরব মুশলিম অনুপ্রবেশ ও

সেসব খবর এই সব খবরের সংস্থাগুলিতে উঠে আসে না এই জন্যে যে, এদের মাথার ওপর আল্‌ কুদ্দুস আল্লাতালা রেখেছেন সেই পবিত্র গন্থ এবং 'স্যাকরেড সোর্ড'-এর ভয় এবং মাতা মেরীর সাথে সাম্প্রতিক ভ্যাটিক্যানের কন্যাটি এদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন বাইবেল এবং

সরব জেহাদী হানা অন্যদিকে চলেছে 'সাইলেন্ট খৃস্টানাইজেশন' এবং হিন্দুর মঠ-মন্দির সন্ন্যাসী সংগঠনগুলির সম্ভ্রম-হনন। অতি সাম্প্রতিক ঘটনায় সাধবী প্রজ্ঞা সিং, কর্ণেল পুরোহিত এবং আর্মি অফিসার উপাধ্যায়ের আটক সেই একই লক্ষ্যের দুই ধারার অভিন্ন রণকৌশলের ফল মাত্র।

কিন্তু বাপেরাও নাকি খোদ পাপের হাত থেকে নিস্তার পায় না। পায় না বলেই নাকি বেইমান জাফর আলী খাঁ-কে সেরাজের কবরের মাটিতে গড়াগড়ি যেতে হয়েছিল। মীরকাশীমের লাস কাবুলের রাস্তায় শকুনে ছিঁড়েছিল, মীরনের লাস কুকুরে খেয়েছিল, জগৎশেঠদের নদীগর্ভে শেষ ঠাঁই নিতে হয়েছিল। মৃত্যু মাত্রেই বেদনার—সাম্প্রতিক তাজকান্ডের অমর শহীদ এ টি এস প্রধান হেমন্ত কারকারে, এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট বিজয় সলসকর এবং মুম্বাই পুলিশের এ্যাডিশনাল কমিশনার অশোক কামতের বৃত্তিগত কর্তব্যাভিযানে বীরের মৃত্যুবরণ আমাদের কাছে যুগপৎ দুঃখ ও গর্বের হলেও ঠিক এই মুহূর্তে কারার অন্তরালে নীরবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সেই সব প্রজ্ঞা-পুরোহিত উপাধ্যায়েরা এদের অমর আত্মার সদগতির জন্যে প্রার্থনা করতে করতেও মুচকি হেসে পাশ ফিরে শুতে পারেন ঃ ঈশ্বর চিরকালই পাপকে দাহ করেন।.....

কিন্তু প্রশ্ন থাকতেই পারে, ধনঞ্জয়ের একটি ধর্ষণ ও খুনের দায়ে তার ফাঁসীর আদেশ কার্যকর করার দাবিতে যারা রাস্তায় মিছিল করে, স্বাধীন ভারতের পার্লামেন্টে দেশের তাবৎ নেতৃমন্ডলীর প্রাণনাশের চক্রান্তের রূপকার ফাঁসীর দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আফজল গুরুর প্রশ্নে তাদের সাথেই দেশের সংবাদসংস্থাগুলি নীরব কেন থাকে? কেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর হত্যার সাথে জড়িত দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদী নলিনীর সাথে প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যগণের আজ সরব সহানুভূতির বাতাস প্রবাহিত হয়? প্রশ্ন থাকবেই, আজ যারা নিয়ন্ত্রিতরেখা পেরিয়ে 'ফ্ল্যাস আউট অপারেশনের' সৌখিন বিবৃতি দিচ্ছেন, কেন তারা সেদিন আদবানীর সেই 'প্রি এম্পটিভ মেজারের' বিরোধিতায় উত্তাল হয়ে উঠেছিলেন? প্রশ্ন রইবেই, কাদের এবং কোন্‌ গোপন প্রশ্রয়ে নাগাল্যান্ড, মিজোল্যান্ড, মেঘালয় অরুণাচল পোস্টার পড়ে ঃ নো এন্ট্রি ফর ইন্ডিয়ান ডগস? কোন্‌ নীতির জন্যে কাশ্মীরে তিন লক্ষ হিন্দু পন্ডিত স্বভূমি থেকে স্বগৃহ হারা, মিজোরামের পঞ্চাশ হাজার হিন্দু রিয়াং উপজাতি স্বদেশে স্বরাজ্য থেকে উৎসাদিত হয়ে ত্রিপুরা বর্ডারে রাত্রি কাটায় এবং কোনও সাংবাদিক সততায় এ দেশের সংবাদপত্রে সেই সব হতভাগ্য নির্যাতীত মানবাত্মাগুলি নীরব উপেক্ষায় নীরবে গুমরে কাঁদে? প্রশ্ন উঠবে না, কেন অন্ধ্রের ত্রিশ জন জঙ্গিকে বন্দী করার পরও তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়, কেন বাটালা হাউসের সেইসব বিধর্মী জঙ্গিদের সরকারি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অর্থে আইনী পরিষেবা দেওয়া হয়, কেন সন্ত্রাস দমনে ইজরায়েলীদের 'বুলেটের বদলে বুলেট' নয়, নরেন্দ্র মোদীর মতো 'ক্রিয়ার বদলে প্রতিক্রিয়া' নয়, বিদেশী ধৃত জঙ্গির দেশী আশ্রয়দাতাদের জন্যে পিটুনিকর নয়? প্রশ্ন রইবেই, সঙ্ঘ পরিবার নয়, কেন খোদ 'ওয়াল স্ট্রীট জার্নালকেও' আজ লিখতে হয় —''বিগত পাঁচ বছর ধরে ভারতের ইউ পি এ পরিচালিত (সেকুলার) সরকার সন্ত্রাসদমনে কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি?'' কেন 'কুখ্যাত' বাল থ্যাকারের সেই কথাটাও এখন অর্থবহ হয়ে উঠবে না যে, ''হিন্দু সন্ত্রাসবাদের বীজ খুঁজতে খুঁজতেই এদেশের গোয়েন্দা পুলিশের তাবৎ দম ফুরিয়ে যায়?''....

ভারতবর্ষের চারটি রাজ্য খৃস্টান-অধ্যুষিত এবং খৃস্টান শাসিত দুই রাজ্যকে শাসন করে সংখ্যাগুরু মুসলিম সম্প্রদায়, পশ্চিমবাংলার আটটি জেলায় অনুপ্রবিষ্টগণ জেলাগুলিকে করেছে সংখ্যালঘু প্রাধান্যযুক্ত, এগারোটি জেলায় মুসলিম সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে নির্বাচনী ফলাফল। অসম হয়েছে ভারতের পাকিস্তান। পশ্চিমবাংলা, গুজরাট, মুম্বাই, দিল্লীতে গরীব হিন্দু মুসলমানের ক্ষিদের খাবার কেড়ে খাচ্ছে (ভাগ নিচ্ছে) অনুপ্রবেশকারী মুসলমানেরা। প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়ে চলেছে জনসংখ্যার হার। যে অসম সাহসী সাংবাদিকগণ জীবন বিপন্ন করে তাজকান্ডে আজ সারাদিন আমাদের সংবাদ পরিবেশন করে জাতির কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন হচ্ছেন—কেন সেই সব সংবাদসংস্থার সাংবাদিকতায় উঠে আসে না এসব খবর?....

সেসব খবর এই সব খবরের সংস্থাগুলিতে উঠে আসে না এই জন্যে যে, এদের মাথার ওপর আল্‌ কুদ্দুস আল্লাতালা রেখেছেন সেই পবিত্র গন্থ এবং 'স্যাকরেড সোর্ড'-এর ভয় এবং মাতা মেরীর সাথে সাম্প্রতিক ভ্যাটিক্যানের কন্যাটি এদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন বাইবেল এবং পকেটে জোগাচ্ছেন ডলার। 'আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকবো'—কেননা সামনেই ভোট। আল্লা মালেক— আসেন, আসেন।....

পুনশ্চ, তাজকান্ডের খবর পেয়েই আমার পাড়ার এক অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার বললেন, বড় মুসকিলে পড়ে গেল ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ, আবার একজন সাধবী-টাধবী তো খুঁজে বের করতে হবে!

Swastika
22 December - 2008, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

গৈরিক পতাকার তলায় প্রবাসী হিন্দুরা

হায়দ্রাবাদে বিশ্ব বিভাগ সমিতি শিক্ষাবর্গ-২০০৮।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আমাদের শাস্ত্রে বিশ্বকে আপন বলে ভাবার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে — বসুধৈব কুটুম্বকম্, সকলের জন্য মঙ্গল কামনার তত্ত্ব কেবলমাত্র হিন্দু শাস্ত্রেই বর্ণিত। বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর ভাবনা কেবলমাত্র হিন্দু সংস্কৃতিতেই পাওয়া যায়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এইসব তত্ত্বকথাকে শুধুমাত্র পুঁথিগত করে রাখেনি বরং এই আদর্শেই বিশ্বকে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা করে চলেছে। ঘোর বিরোধীরাও একথা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, সঙ্ঘের একটা আদর্শ আছে। যে আদর্শ প্রকৃত দেশভক্ত তৈরি করে। এই ভক্তিই দেশ পূজা। যা প্রকৃত মানুষের পরিচয়। একথা কারও অজনা নয় যে এইসব আদর্শ নীতি শুধুমাত্র ভারতের জন্য নয়, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্যই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও সঙ্ঘের কাজ চলছে। এই কাজ কোথাও 'হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ', 'সনাতন ধর্ম সঙ্ঘ' ইত্যাদি নামে পরিচালিত হচ্ছে। বিদেশের বুকে স্বয়ংসেবকএবং সেবিকারা যেসব কার্যক্রমগুলিতে অংশ নেয় তারই একটি প্রতিবেদন এখানে তুলে ধরা হল।

বৃটেনে চলতি বছরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক এম এস গোলওয়ালকর। শ্রীগুরুজীর ওপর আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বৃটেনে প্রবাস করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ মোহনরাও ভাগবত। তিনি গত ২৭ সেপ্টেম্বর উত্তর লন্ডনে শ্রীগুরুজীর ওপর প্রকাশিত পুস্তকের উন্মোচন অনুষ্ঠানে অংশ নেন। প্রায় ৬০০ প্রতিনিধি যোগ দেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সাংবাদিক রাজনীতিবিদ সহ সমাজের বিভিন্ন বিশিষ্টজনরা।

শ্রীভাগবত তাঁর ভাষণে বলেন, হিন্দুধর্ম সর্বদা মন ও শরীরের মধ্যে সমতা বিধান করে চলে। হিন্দুধর্ম প্রকৃতপক্ষে মানবধর্ম। হিন্দুধর্ম ও শ্রীগুরুজীর ওপরও তিনি আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানের শেষে 'এম এস গোলওয়ালকর, হিজ ভিশন অ্যান্ড মিশন' নামে একটি বই-এর আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন শ্রীমোহনরাও ভাগবত।

আমেরিকাতেও শ্রীভাগবতের উপস্থিতিতে শ্রীগুরুজী উপর লিখিত এই গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করা হয়। প্রায় ২ শতাধিক হিন্দু এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের সিংহভাগ জুড়ে ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিকেরা। হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-এর আমেরিকা শাখার সভাপতি অধ্যাপক বেদ নন্দ শ্রীগুরুজীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার ওপর আলোকপাত করেন।

শ্রী ভাগবতের এই প্রবাসকে সামনে রেখে সেখানকার স্বয়ংসেবকেরা নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে কার্যক্রমের আয়োজন করেন। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে স্থানীয় শাখার কার্যকর্তারা একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। সুরিনামে একটি সম্মেলনে শ্রীভাগবত উপস্থিত ছিলেন। ওই কনফারেন্সে হিন্দু সমাজ, ধর্মান্তরকরণ, উচ্চশিক্ষা প্রকৃতি বিষয়ের ওপর উপস্থিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে শ্রীভাগবত এক আলোচনায় অংশ নেন। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা প্রবাসে থেকেও হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করায় তিনি তাঁদের ধন্যবাদ জানান।

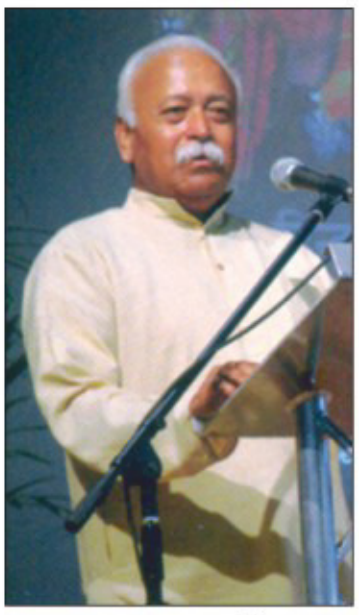

ভাষণরত মোহনজী

কভেন্ট্রিতে চলছে শাখা।

ইংলণ্ডে অমরনাথ জমি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল।

গায়ানাও শ্রীভাগবতের প্রবাস থেকে বাদ পড়েনি। সেখানেও একটি আলোচনা সভায় তিনি বক্তব্য রাখেন। হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দীভাষা ও সংস্কৃতের ওপর এক আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন গায়ানার সঙ্ঘচালক ভারত জগদেও।

ত্রিনিদাদ ও টোবাগো-তেও হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসবে শ্রীভাগবত অংশগ্রহণ করেন। ২০০ জন স্বয়ংসেবক ও সেবিকা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত অতিথিরা বিশ্ব কেন হিন্দুত্বমুখী হচ্ছে—এই বিষয়ের ওপর এক আলোচক্রে-র আয়োজন করেন। তাঁরা এই বিষয়ে শ্রীভাগবতের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। সেখানে এক ৮৫ ফুট মহাবীর হনুমান বিগ্রহ দর্শনও ছিল তাঁর সফরসূচীর অঙ্গ।

শ্রীভাগবতের ১৫ দিনের সফর সূচী এখানেই শেষ হয়। সঙ্ঘের অধিকারীদের এইরকম সফর ছাড়াও বিদেশে সঙ্ঘের নিয়মিত কার্যক্রমগুলিও যথারীতি পালিত হয়েছে। যেমন সঙ্ঘশিক্ষা বর্গ। এবছর বৃটেনে অওসওয়াল-এ অনুষ্ঠিত হয় এই বর্গে। প্রবাসী, অধিকারী, কার্যকর্তা সহ প্রায় অর্ধশতাধিক স্বয়ংসেবক এই শিক্ষাবর্গে অংশ নেয়। বর্গে যোগাসন, ঘোষ, খেলা প্রভৃতির বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এবছর বিশ্ব বিভাগ সমিতি শিক্ষাশিবির -এর প্রশিক্ষণ বর্গ ভাগ্যনগরে (হায়দরাবাদ) অনুষ্ঠিত হয়। ১১টি দেশের সেবিকারা এতে অংশ নেয়। এককথায় বর্ণাঢ্য ছিল এই বর্গ। ১৬ থকে ৫০ বছর বয়সী সেবিকারা বর্গে উপস্থিত ছিলেন।

৩০০ সেবিকা পূর্ণ গণবেশে কার্যক্রমে অংশ নেয়। পথ সঞ্চালনও করেন তাঁরা। সঙ্গে থাকে ঘোষ (ব্যান্ড) বাহিনীও।

শুধুমাত্র প্রচলিত উৎসব নয়, বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে হিন্দুরা আক্রান্ত হলে প্রবাসী হিন্দুরা প্রতিবাদ বিমুখ নয়। এমনই দৃষ্টান্ত তারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে। অমরনাথের জমি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে বৃটেনের হিন্দুরা জোরালো প্রতিবাদ জানান। তাঁরা রাজপথে এক নীরব প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। এসবের মাঝে ছিল কিন্তু উৎসবের আনন্দও। যেমন—বিজয়া দশমী, গণপতির আরাধনা ইত্যাদি। বিদেশের মাটিতেও সেবিকারা বিশেষ ধুমধামের সঙ্গে গণপতি (গণেশ) উৎসব পালন করেন। রাখীবন্ধন উৎসবও বাদ পড়েনি। বৃটেনের অফিস কাছারিতে তাঁরা অফিসের কর্মীদের হাতে হাতে অটুট বন্ধনের নির্দশন রূপে রাখী পরিয়ে দেন।

শুধু কী নিজেদের জন্য। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজেও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে হাত বাড়িয়ে দেন স্বয়ংসেবক ও সেবিকারা। 'সেবা'-র মাধ্যমে গত ১৩ সেপ্টেম্বর অর্থ সংগ্রহে রাস্তায় নামেন তাঁরা। সারা রাত ধরে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। ৭০০ জন স্বয়ংসেবক ও সেবিকা এতে অংশ নেয়। তাঁরা মেডিক্কেল অ্যাসোসিয়েশনের ও বৃটেনের মমতা ওয়ালভার ট্রাস্ট-এর হাতে সংগৃহীত টাকা তুলে দেন — অন্ধ শিশুদের দেখভাল ও চিকিৎসার জন্য। যথারীতি সেবা কাজ থেকে বাদ যায়নি ভারতও। বিহারের ভয়াবহ বন্যা কবলিত মানুষদের জন্যও প্রবাসীরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বৃটেনের বিভিন্ন শহরে স্থানীয় স্বয়ংসেবক ও সেবিকরা অর্থ সংগ্রহ করে ভারত সরকারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

এ বছরও বাদ যায়নি হিন্দু প্রতিভা বা জিনিয়াস অনুসন্ধান। ২০০৬ সালে প্রথম ভারতীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং কেনিয়ার হিন্দু সেবিকা সমিতির উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এবছরও কেনিয়াতে সেই ধারা অব্যাহত থেকেছে। গীতা, বেদ, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন প্রতিযোগীদের করা হয়। ১১টি রাউণ্ডে সমগ্র প্রতিযোগিতাটি সম্পন্ন হয়।

স্বয়ংসেবক ও নাগরিক সমাবেশ
—ঃ আয়োজক ঃ—
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, উত্তরবঙ্গ
স্থান-মালদহ রামকৃষ্ণ মিশন সংলগ্ন ময়দান
২৪ ডিসেম্বর, ২০০৮ বুধবার, সময় — বিকেল ৩টা
বক্তা ঃ পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীসুদর্শনজী
পথসঞ্চলন আরম্ভ — দুপুর ১ টা-তে

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com